বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান*

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা বাংলাদেশের রেল পরিবহণ ব্যবস্থার একটা বস্তুনিষ্ঠ বিশে-ষণ করার চেষ্টা করেছি। প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমাদের দেশের রেলপথের বিদ্যমান চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে এর সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং সবশেষে বাংলাদেশ রেলওয়ের সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরী ও এর সম্ভাবনার দিগন্তসমূহ চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

যেকোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেল পরিবহণের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে বাংলাদেশের আদৌ কোন অগ্রগতি নেই। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের স্বাধীনতার ৩৩ বছরে এ দেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পেয়েছে প্রায় ১০০ কিলোমিটার (সারণী-২)। বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান এরকম হত-দরিদ্র ও নৈরাশ্যজনক চিত্র। রেলপথকে অর্থনীতির হৃৎপিন্ড বলা যায়। মানবদেহের হৃৎপিন্ড থেমে গেলে যেমন মানুষটি মরে যায়, ঠিক তেমনিভাবে রেলপথের অব্যাহত ও সুষ্ঠু বিকাশের অভাবে অর্থনীতির স্বাস্থ্যও ভাল থাকতে পারে না। বিগত তিন দশকেরও বেশী সময়ে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এরকম একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় চলছে এক মহানৈরাজ্য। পঁচাত্তর পরবর্তী এদেশের সরকারগুলো তথাকথিত ব্যক্তিগত খাতের বিকাশের নামে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেছে। বেসরকারী খাতের বাস ও ট্রাক মালিকদের মুনাফার স্বার্থে রেলের বিকাশকে করেছে বাধাগ্রস্থ। অথচ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, ঐ সকল দেশের উন্নতির সাথে সাথে রেলপথের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে, উন্নত হয়েছে, আরাম-দায়ক হয়েছে। আমাদের দেশের চেয়ে অনেক ছোট্ট দেশ কিউবা জনসংখ্যা ও আয়তন উভয় দিক থেকেই (সারণী-১), অথচ তার রেল লাইনের দৈর্ঘ্য বাংলাদেশের রেলপথের দৈর্ঘ্যের প্রায় দ্বিগুণ। আর তাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় রেল পরিবহনের ক্ষেত্রে আমরা কোথায় অবস্থান করছি তারই একটা হিসেব কষার প্রয়াস নিয়েছি আলোচ্য প্রবন্ধে।

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

.

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ঃ আমাদের দেশের অর্থনীতির হৃৎপিন্ড হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বকে উপস্থাপিত করা। আর এ মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

১। বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান অবস্থার একটা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করা ;

২। এর সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ;

৩। রেলপথের বিকাশের স্বার্থে এ সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় বাতলানো এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্ভাবনার দিগন্তসমূহ চিহ্নিত করা।

পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য মূলতঃ মাধ্যমিক উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছেঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সালের তথ্য বইসমূহ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সনের বর্ষগ্রন্থসমূহ, ওয়ার্লড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর্স এবং বাংলাদেশের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার দলিলসমূহ। এতদ্ব্যতিত আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রকাশিত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ধরনের গবেষণাধর্মী গ্রন্থেরও সহায়তা নেয়া হয়েছে।

অবকাঠামো এবং রেলপথ

অবকাঠামো বলতে এমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধার সমষ্টিকে বুঝায় যাদের অনুপস্থিতিতে উৎপাদন কর্মকান্ড হয় আদৌ সম্ভব নয় অথবা আংশিকভাবে সম্ভব। অবকাঠামো দু'ধরনের ঃ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক। অর্থনৈতিক অবকাঠামো মূলতঃ উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। আর সেকারণে একে উৎপাদন অবকাঠামো নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে (১৭)। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপাদানগুলো উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও আংশিকভাবে ইহারা জনগণকেও বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মূল খাতগুলো হচ্ছে ঃ পরিবহণ, যোগাযোগ, বিদ্যুত, পানি সরবরাহ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ব্যবসা-বানিজ্য। পক্ষান্তরে, সামাজিক অবকাঠামো প্রধানতঃ সেবাধর্মী, যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পর্যটন ইত্যাদি। আলোচ্য প্রবন্ধে যেহেতু আমরা পরিবহনের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অবকাঠামোর একটি উপখাত অর্থাৎ রেলপথ নিয়েই আলোচনা করবো, সেহেতু রেলপথ বা রেল পরিবহণ নিয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

পরিবহণ মূলতঃ চার ধরনের ঃ স্থল-,নৌ-, বিমান- ও নল পরিবহণ। স্থল পরিবহণ আবার দু'প্রকারেরঃ সড়ক- ও রেল পরিবহণ। দ্রুততা, বহন ক্ষমতা, নিরাপত্তা ও পরিবহণ খরচসহ প্রায় সকল বিবেচনাতেই রেল পরিবহণ হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক। নৌ পরিবহনে খরচ রেলের তুলনায় কিছুটা কম হলেও এর গতির সীমাবদ্ধতার কারণে রেল অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য। আর স্থল পরিবহণের ক্ষেত্রে রেলের কোনও জুড়ি নেই। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, যে দেশ যতবেশী উন্নত সেদেশের রেলপথও তত বেশী উন্নত ও বিকশিত। সারণী-১ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রেল লাইনের দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বিশ্বে প্রথম স্থানে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

যার রয়েছে ১৬০,০০০ কিলোমিটার রেললাইন; দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া- ৮৬,০৭৫ কিলোমিটার; তৃতীয় স্থানে ভারত- ৬২,৭৫৯ কিলোমিটার এবং চতুর্থ স্থানে চীন- ৫৮,৬৫৬ কিলোমিটার। অবশ্য প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল প্রজাতন্ত্রগুলো বিবেচনায় নিলে তার অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের উপরে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। অন্যদিকে রেললাইনের বিদ্যুতায়নের দিক থেকে রাশিয়া প্রথম স্থানে আছে (৪০,৯৬২ কিঃ মিঃ), ২য় স্থানে আছে জার্মানী (১৯,০৭৯ কিঃ মিঃ), ৩য় স্থানের অধিকারী চীন (১৪,৮৬৪ কিঃ মিঃ) এবং ৪র্থ স্থানে আছে ভারত (১৪,২৬১ কিঃ মিঃ)। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের মাত্র ৪৮৪ কিঃ মিঃ রেল লাইন বিদ্যুতায়িত। মাত্র ৪৯,০৩৫ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট এবং ৫.৪ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ স্লোভাকিয়ার রেললাইনের দৈর্ঘ্য ৩,৬৬২ কিঃ মিঃ (বাংলাদেশের মাত্র ২,৭৬৮.৩৭ কিঃ মিঃ) যার মধ্যে ১,৫৩৬ কিঃ মিঃ বিদ্যুতায়িত। আর জর্জিয়ার মত ছোট্ট দেশটির (আয়তন- ৬৯,৭০০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং লোকসংখ্যা মাত্র ৫ মিলিয়ন) রেলপথের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১,৫৬২ কিঃ মিঃ যার প্রায় গোটাটাই বিদ্যুতায়িত (১,৫৪৪ কিঃ মিঃ)। এমন কি কিউবার মত তৃতীয় বিশ্বের দেশটিরও (আয়তন- ১১০,৯০০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং লোকসংখ্যা মাত্র ৯.৭ মিলিয়ন) রয়েছে বিশাল বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্ক (রেল লাইনের দৈর্ঘ্য- ৪,৬৬৭ কিঃ মিঃ)। সুতরাং আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে আমরা নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, রেলওয়ে হচ্ছে গোটা অর্থনীতির চালিকা শক্তি, এর হৃৎপিন্ড। উন্নত দেশগুলো তাই তাদের উন্নতির যাত্রালগ্ন থেকেই রেলপথের বিকাশ ও এর শ্রীবৃদ্ধির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। অথচ আমাদের দেশে পরিবহনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতটি এখনও পর্যন্ত অবহেলিত রয়ে গেছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা এ খাতটির বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র উপস্থাপন করবো।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। প্রায় ১৪২ বছর পূর্বে এর জন্ম হয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐপনিবেশিক আমলে। সর্বপ্রথম ১৮৬২ সালের ১৫-ই নভেম্বর দর্শনা ও জগতির মধ্যবর্তী ৫৩.১১ কিঃ মিঃ ব্রড গেজ্ লাইন উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। ঐ সময়ে বৃটেনে গঠিত রেলওয়ে কোম্পানীগুলোই এ অঞ্চলের রেললাইনের নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত ছিল। দর্শনা-জগতি লাইন নির্মাণ করেছিল ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে। পহেলা জানুয়ারী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এ লাইনটি গোয়ালন্দ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল। ১৮৭৪-১৮৭৯ সময়ে সারা-চিলাহাটি, পার্বতীপুর-দিনাজপুর এবং পার্বতীপুর-কাউনিয়া মিটার গেজ লাইন এবং দামুকদিয়া-পোড়াদহ ব্রডগেজ্ লাইন নির্মিত হয়। ১৮৮২-১৮৮৪ সময়ে বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ে কোম্পানী নামের অন্য একটি কোম্পানী বেনাপোল-খুলনা ব্রডগেজ্ লাইনটি নির্মাণ করে। প্রথমদিকে অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীরা শুধুমাত্র তাদের বানিজ্যিক প্রয়োজনেই এ অঞ্চলে রেল লাইন নির্মাণ শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদী ঐপনিবেশিক বৃটিশ সরকার তাদের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থে ১৮৮৪ সালের ১-লা জুলাই ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ৪-ঠা জানুয়ারী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ১৪.৯৮ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য ঢাকা-নারায়নগঞ্জ মিটার গেজ্ লাইন নির্মাণ করে ঢাকা ষ্টেট রেলওয়ে যা পরবর্তীতে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের সাথে অঙ্গীভূত হয়। ১৮৮৫ সালেই ঢাকা ষ্টেট রেলওয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনটি নির্মাণ সম্পন্ন করে। ১-লা এপ্রিল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে নর্দার্ন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের সাথে একীভূত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের সহায়তায় আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে নির্মানের কাজ শুরু হয় যার দায়িত্ব পরবর্তীতে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী গ্রহণ করে।

সারণী ১ : বিশ্বের কয়েকটি দেশের রেল পরিবহনের চিত্র, ২০০১ সালে

দেশের নাম	আয়তন, বঃ কিঃ মিঃ	লোক সংখ্যা মিঃ	রেল লাইনের দৈর্ঘ্য, কিঃ মিঃ		ট্রাফিক ডেন্সিটি, কিঃ মিঃ প্রতি ট্রাফিক একক*	উৎপাদনশীলতা র্মচারী প্রতি ট্রাফিক একক**	যাত্রী ও পণ্য রাজস্বের অনুপাত***
			মোট	বিদ্যুতায়িত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। আর্মেনিয়া	২৯,৮০০	০২.৯	৮৪২	৭৮৪	৪৬৫	৮০	০.২৩
২। ইতালী	৩০১,২৪৫	৫৭.৫	১৬,৪৯৯	১০,৯৩৭	৪,১০২	৬১৮	১.৪২
৩। ইউক্রেইন	৬০৩,৭০০	৪৯.৬	২২,৩০২	৯,১৭০	৯,৫৩৫	৫৯৮	-
৪। এস্তোনিয়া	৪৫,১০০	০১.৪	৯৬৮	১৩২	৭,৯৯৯	১,৩৫৮	২.৩৬
৫। কাজাখস্থান	২,৭১৭,৩০০	০৫.৩	১৩,৫৪৫	৩,৭২৫	৯,৯৮১	১,০৬৯	-
৬। কিউবা	১১০,৯০০	০৯.৭	৪,৬৬৭	১৩২	৪৬৮	৮১	-
৭। চীন	৯,৫৬০,৯০০	১,২৭৫.১	৫৮,৬৫৬	১৪,৮৬৪	৩০,২৬২	১,১৫৫	১.১৯
৮। জর্জিয়া	৬৯,৭০০	০৫.০	১,৫৬২	১,৫৪৪	২,৭৯৪	২৭৬	০.৩৭
৯। জাপান	৩৭৭,৭২৭	১২৭.১	২০,১৬৫	১২,০৮০	১৩,০৪৮	১,৫২৮	-
১০। জার্মানী	৩৫৭,৮৬৮	৮২.০	৩৬,৬৫২	১৯,০৭৯	৪,১২৮	৬৮১	২.৭৭
১১। তুরস্ক	৭৭৯,৪৫২	৬৬.৭	৮,৬৭১	১,৭৫২	১,৭৯৮	৩৩০	১.২০
১২। থাইল্যান্ড	৫১৩,১১৫	৬২.৮	৪,০৪৪	-	৩,৩৪২	৬৬০	০.৭৫
১৩। দক্ষিণ কোরিয়া	৯৯,২৭৪	৪৬.৭	৩,১২৩	৬৬৮	১২,৪৫৬	১,৩২৩	১.৪৩
১৪। পাকিস্তান	৮০৩,৯৪০	১৪১.৩	৭,৭৯১	২৯৩	২,৮৩৮	২৩২	০.২৮
১৫। পোল্যান্ড	৩১২,৬৮৩	৩৮.৬	২২,৫৬০	১১,৮২৬	৩,৫৩৭	৪১৫	০.৭৯
১৬। ফিনল্যান্ড	৩৩৮,১৪৫	০৫.২	৫,৮৫৪	২,৩৭২	২,৩০৮	১,০৫৪	২.৪৭
১৭। ফ্রান্স	৫৪৩,৯৬৫	৫৯.২	৩২,৫১৫	১৪,১০৪	৩,৮৫৪	৭১৫	১.৫৪
১৮। বাংলাদেশ	১৪৩,৯৯৮	১৩৭.৪	২,৭৬৮	-	১,৭০৪	১২৬	০.২৪
১৯। বুলগেরিয়া	১১০,৯৯৪	০৭.৯	৪,২৯০	২,৭০৮	১,৮৪৬	২১৬	০.৮৯
২০। বেলারুশ	২০৭,৬০০	০৯.৪	৫,৫১২	৮৭৪	৭,৮৫৭	৬৩০	-
২১। ভারত	৩,২৮৭,২৬৩	১,০০৮.৯	৬২,৭৫৯	১৪,২৬১	১১,৭২৫	৪৬৭	০.৩১
২২। যুক্তরাজ্য	২৪২,৫৩৪	৫৯.৪	১৭,০৬৭	৫,২২৫	৩,৫০০	২,৬৭৮	-
২৩। যুক্তরাষ্ট্র	৯,৩৭২,৬১০	২৮৩.২	১৬০,০০০	৪৮৪	১৩,৮০০	১৩,৪৭৬	৯.২৮
২৪। রাশিয়া	১৭,১০০,০০০	১৪৫.৫	৮৬,০৭৫	৪০,৯৬২	১৫,৮৫৪	১,০৫৪	০.৯৭
২৫। লাটভিয়া	৬৩,৭০০	০২.৫	২,৩৩১	২৫৮	৫,৮৩৪	৯১৭	-
২৬। লিথুয়ানিয়া	৬৫,২০০	০৩.৪	১,৯০৫	১২২	৪,১৭১	৬১১	-
২৭। সুইডেন	৪৪৯,৯৬৪	০৮.৮	১০,০৬৮	৭,৪০৫	২,৪৯২	২,১৪৪	২.৩৪
২৮। স্লোভাকিয়া	৪৯,০৩৫	০৫.৪	৩,৬৬২	১,৫৩৬	৩,৮৫১	৩০২	১.১১

* ট্রাফিক ডেন্সিটি বলতে বুঝায় যাত্রী- কিলোমিটার (যাত্রী ভ্রমনকৃত পথ) ও টন-কিলোমিটার (মেট্রিক টন বাহিত পথ) এর যোগফলকে মোট রেল পথের দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করা।

** উৎপাদনশীলতা বলতে শ্রমিক-কর্মচারীদের বাৎসরিক মাথাপিছু উৎপাদনকে (ট্রাফিক এককে) বুঝায়।

*** যাত্রী ও পণ্য রাজস্বের অনুপাত বলতে গড় যাত্রী ভাড়াকে (মোট যাত্রী রাজস্ব যাত্রী-কিলোমিটার) গড় পণ্য ভাড়া (মোট পণ্য ভাড়া টন-কিলোমিটার) দিয়ে ভাগ করাকে বুঝায়। এ অনুপাত ১ এর কম হলে বুঝতে হবে যে, পণ্য রাজস্ব থেকে যাত্রী সেবায় ভর্তুকী দেয়া হয়েছে।

উৎস ঃ লেখক কর্তৃক ১১, ১২ ও ১৩ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

১-লা জুলাই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা (১৪৯.৮৯ কিঃ মিঃ) এবং লাকসাম-চাঁদপুর (৫০.৮৯ কিঃ মিঃ) মিটার গেজ্ লাইন দু'টি ট্রেন চলাচলের জন্যে খুলে দেয়া হয়। এ লাইন দু'টি নির্মাণ করে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে। ৩-রা নভেম্বর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম-চট্টগ্রাম বন্দর লাইনটি নির্মিত হয় এবং ১৯৯৬ সালে কুমিল্লা-আখাউড়া এবং আখাউড়া-করিমগঞ্জ লাইন দু'টি ট্রেন চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

১৮৯৭ সালে দর্শনা-পোড়াদহ সিঙ্গল লাইনকে ডাবল লাইনে রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৯৮-১৮৯৯ সময়ে ময়মনসিংহ-জগন্নাথগঞ্জ মিটার গেজ লাইনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ১৮৯৯-১৯০০ সময়ে ব্রক্ষ্মপূত্র-সুলতানপুর রেলওয়ে কোম্পানী কর্তৃক সান্তাহার-ফুলছড়ি লাইনটি নির্মিত হয়। আর নোয়াখালী (বেঙ্গল) রেলওয়ে কোম্পানী ১৯০৩ সালে নির্মাণ করে লাকসাম-নোয়াখালী লাইনটি। ১-লা এপ্রিল ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সরকারী কোম্পানী ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে আরও দু'টি কোম্পানীর (বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ে কোম্পানী ও ব্রক্ষ্মপূত্র-সুলতানপুর রেলওয়ে কোম্পানী) মালিকানা অধিগ্রহণ করে। পরবর্তী বছর, অর্থাৎ ১৯০৫ সালে সরকার আরও একটি কোম্পানী (নোয়াখালী (বেঙ্গল) রেলওয়ে কোম্পানী) কিনে নেয়। এ বছরই কাউনিয়া-বোনারপাড়া মিটার গেজ্ লাইনটি ট্রেন চলাচলের জন্যে খুলে দেয়া হয়। ১-লা জানুয়ারী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালী (বেঙ্গল) রেলওয়ে কোম্পানী আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত একীভূত হয়। ১৯০৯ সালে পোড়াদহ-ভেড়ামাড়া সিঙ্গল লাইনটি ডাবল লাইনে রূপান্তরিত হয়।

১৯১০-১৯১৪ সময়ে আখাউড়া-টঙ্গী লাইনটি নির্মিত হয় এবং শাকল-সান্তাহার মিটার গেজ্ লাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯১২-১৯১৫ সময়ে কুলাউড়া-সিলেট লাইনটি ট্রেন চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়। পহেলা জানুয়ারী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পাকশীতে হার্ডিঞ্জ রেল সেতু উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে পদ্মার উত্তর পাড়ের রেলপথের সাথে দক্ষিণ পাড়ের রেলপথের সংযোগ সাধিত হয়। ১৯১৫-১৯১৬ সময়ে সারা-সিরাজগঞ্জ রেল কোম্পানী কর্তৃক সারা-সিরাজগঞ্জ লাইনটি নির্মিত হয়। ১৯১৬ সালেই ভেড়ামাড়া-রেইতা ব্রডগেজ্ লাইনটি ট্রেন চলাচলের জন্যে খুলে দেয়া হয়। ১৯১২-১৯১৮ সময়ে গৌড়িপুর- ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা এবং শ্যামগঞ্জ-ঝাড়িয়াজানজাইল লাইন দু'টি নির্মাণ সম্পন্ন করে ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে কোম্পানী। ১৯১৫-১৯৩২ সময়ে ভেড়ামাড়া-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর সিঙ্গল লাইনটি ডাবল লাইনে রূপান্তরিত হয়। ১০-ই জুন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে একটি ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানী রুপশা-বাগেরহাট ন্যারোগেজ লাইনটির নির্মাণ সম্পন্ন করে। ১৯২৪ সালের জুলাইতে সান্তাহার-পার্বতীপুর মিটার গেজ্ লাইনটি ব্রড গেজে রূপান্তরিত হয়। আর সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সাল নাগাদ পার্বতীপুর-চিলাহাটি মিটার গেজ্ লাইনের ব্রডগেজে রূপান্তরের কাজ শেষ হয়। ১৯২৮ সালে শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ লাইনটি ট্রেন চলাচলের জন্যে খুলে দেয়া হয়। ১৯২৮-১৯২৯ সালে তিস্তা-কুড়িগ্রাম ন্যারো গেজ লাইনটি ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তাগঞ্জ-বাল্লা এবং চট্টগ্রাম-হাটহাজারী লাইন দু'টি ট্রেন চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে হাটহাজারী-নাজিরহাট মিটারগেজ এবং আব্দুলপুর-আমনুরা ব্রডগেজ্ লাইন দু'টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৩১ সালে নির্মিত হয় ষোলশহর-দোহাজারী লাইনটি। ৬-ই ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে মেঘনার উপর রাজা ষষ্ঠ জর্জ রেল সেতুটি উদ্বোধনের ফলে ভৈরব বাজারের সাথে আশুগঞ্জের রেল সংযোগ ঘটে। ১৯৪১ সালে জামালপুর-বাহাদুরাবাদ মিটারগেজ্ লাইনটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের পহেলা জানুয়ারী সরকার আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের মালিকানা গ্রহণ করে এবং একে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সাথে

একীভূত করে নতুন নামকরণ করে "বেঙ্গল এন্ড আসাম রেলওয়ে"। পহেলা অক্টোবর ১৯৪৪ সালে সরকার সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোম্পানীকে অধিগ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়েই শেষ হয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐপনিবেশিক শাসনামলে আমাদের এ অঞ্চলের রেলপথ নির্মানের কাজ।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ফলশ্রুতিতে রেলওয়েও বিভক্ত হয়ে পড়ে অনিবার্জভাবে। বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ের যে অংশটুকু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সীমারেখার মধ্যে পড়ে তাকে নতুনভাবে নামকরণ করা হয় "ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে"। কিন্তু পাকিস্তানীরা নব্য ঐপনিবেশিকতার আশ্রয় নেয় এবং এর নিয়ন্ত্রনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে দেয়। ১৯৪৮-১৯৪৯ সময়ে পাকিস্তানী নব্য উপনিবেশবাদী সরকার ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে কোম্পানী এবং রুপশা-বাগেরহাট ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানীর মালিকানা অধিগ্রহণ করে নেয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২১-শে এপ্রিল যশোর-দর্শনা লাইনটি ট্রেন চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং ১৯৫৪ সালের অক্টোবর নাগাদ সিলেট-ছাতকবাজার লাইনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। নব্য উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ১৯৬১ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারী ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েকে পুণঃনামকরণ করে একে "পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে" বানায়। ১৯৬২ সালে একটি রেলওয়ে বোর্ড গঠন করা হয় এবং রেলওয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যাস্ত করে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়েকে "বাংলাদেশ রেলওয়ে" নামকরণ করা হয়। এ নামেই এখনও পর্যন্ত চলছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৩ বছরে একমাত্র জামতৈল-বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব পর্যন্ত ব্রডগেজ্ লাইনের সম্প্রসারণ কাজটি সম্পন্ন হয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের (শেখ হাসিনার) আমলে ২৩-শে জুন ১৯৯৮ সালে। পরবর্তীতে অবশ্য জয়দেবপুর পর্যন্ত এ লাইনটি সম্প্রসারিত হয় এবং পূর্ব রেলপথের সাথে যুক্ত হয় (২০০৪ সালে)। বাংলাদেশ রেলওয়ের আবির্ভাবের এ শানে নযুল টুকুর আলোকে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আমাদের এ ভূ-খন্ডে রেললাইন যেটুকু গড়ে উঠেছে তা প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী ঐপনিবেশিক বৃটিশ বেনীয়াদের আমলেই হয়েছে। নব্য উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী আমলে এর উল্লেখ করার মত কোনও সম্প্রসারণ বা উন্নতি হয় নি। অথচ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের রেলপথের সম্প্রসারণ করে প্রায় দ্বিগুণে উন্নীত করে। বর্তমানে সেখানে রেল লাইনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭,৭৯১ কিঃ মিঃ (সারণী-১)। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৩ বছরের জীবনে রেলপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির বদলে আরও হ্রাস পেয়েছে (সারণী-২)। শুধু লাইনের দৈর্ঘ্য কমেছে তাই-ই নয়, বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক অধঃপতন ঘটেছে এ সময়ে।

সারণী-২ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের গমন পথের দৈর্ঘ্য ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ২০০০-২০০১ সাল নাগাদ প্রায় ৯০ কিঃ মিঃ হ্রাস পেয়েছে, অর্থাৎ এর সূচক হ্রাস পেয়ে ৯৬.৯ এ দাঁড়িয়েছে। অনুরূপভাবে হ্রাস পেয়েছে ষ্টেশনের সংখ্যা ঃ ১৯৬৯-৭০ সালে ষ্টেশন ছিল ৪৭০ টি যা কমে গিয়ে ২০০০-২০০১ সালে গিয়ে ঠেকেছে ৪৫৯ এ। তবে মোটের উপর ষ্টেশন সংখ্যা হ্রাস পেলেও, বৃদ্ধি পেয়েছে মিটরগেজ্ ষ্টেশনের সংখ্যা। কিন্তু ব্রডগেজ্ ষ্টেশনের সংখ্যা এত বেশী কমেছে যে, মোটের উপর ১১ টি ষ্টেশন কমেছে ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায়। গমনপথের ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক এর উল্টোটা, অর্থাৎ ব্রডগেজ্ লাইনের দৈর্ঘ্য কিছুটা বাড়লেও তার চেয়ে বেশী হ্রাস পেয়েছে মিটারগেজ্ পথের দৈর্ঘ্য। যে কারণে মোট দৈর্ঘ্য ৯০ কিলোমিটারের মত হ্রাস পেয়েছে।

সারণী ২ : গেজ্‌ভিত্তিক বাংলাদেশ রেলওয়ের গমন পথের দৈর্ঘ্য ও ষ্টেশনের সংখ্যা, ১৯৬৯-২০০১ সময়ে

১৯৬৯-৭০ = ১০০.০

বছর	ব্রড গেজ্‌				মিটার গেজ্‌						মোট	
	ষ্টেশন		গমনপথ		ষ্টেশন		গমনপথ		ষ্টেশন		গমনপথ	
	সংখ্যা	পরিবর্তন, %	কিঃ মিঃ	পরিবর্তন, %	সংখ্যা	পরিবর্তন, %	কিঃ মিঃ	পরিবর্তন, %	সংখ্যা	পরিবর্তন, %	কিঃ মিঃ	পরিবর্তন, %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯৬৯-৭০	১৫৮	১০০.০	৯২৩.০৭	১০০.০	৩১২	১০০.০	১,৯৩৫.১৬	১০০.০	৪৭০	১০০.০	২,৮৫৮.২৩	১০০.০
১৯৭২-৭৩	১৫৯	১০০.৬	৯৬৩.৯	১০৪.৪	৩১২	১০০.০	১,৯১০.২	৯৮.৭	৪৭১	১০০.২	২,৮৭৪.২	১০০.৬
১৯৭৪-৭৫	১৬১	১০১.৯	৯৬৩.৯	১০৪.৪	৩১৪	১০০.৬	১,৯১০.২	৯৮.৭	৪৭৫	১০১.১	২,৮৭৪.২	১০০.৬
১৯৮৯-৯০	১৬৩	১০৩.২	৯২৩.৫৩	১০০.১	৩৩৯	১০৮.৭	১,৮২২.১২	৯৪.২	৫০২	১০৬.৮	২,৭৪৫.৬৫	৯৬.১
১৯৯০-৯১	১৬৩	১০৩.২	৯২৩.৫৩	১০০.১	৩৩৯	১০৮.৭	১,৮২২.১২	৯৪.২	৫০২	১০৬.৮	২,৭৪৫.৬৫	৯৬.১
১৯৯১-৯২	১৫২	৯৬.২	৯২৩.৫৩	১০০.১	৩৩৭	১০৮.০	১,৮২২.১২	৯৪.২	৪৮৯	১০৪.০	২,৭৪৫.৬৫	৯৬.১
১৯৯২-৯৩	১৫২	৯৬.২	৮৮৩.৮৯	৯৫.৮	৩৩৮	১০৮.৩	১,৮২২.১২	৯৪.২	৪৯০	১০৪.৩	২,৭০৬.০১	৯৪.৭
১৯৯৩-৯৪	১৫২	৯৬.২	৮৮৩.৮৯	৯৫.৮	৩৩৭	১০৮.০	১,৮২২.১২	৯৪.২	৪৮৯	১০৪.০	২,৭০৬.০১	৯৪.৭
১৯৯৪-৯৫	১৫২	৯৬.২	৮৮৩.৮৯	৯৫.৮	৩৩৭	১০৮.০	১,৮২২.১২	৯৪.২	৪৮৯	১০৪.০	২,৭০৬.০১	৯৪.৭
১৯৯৫-৯৬	১৫২	৯৬.২	৮৮৩.৮৯	৯৫.৮	৩৩৭	১০৮.০	১,৮২২.১২	৯৪.২	৪৮৯	১০৪.০	২,৭০৬.০১	৯৪.৭
১৯৯৬-৯৭	১৫২	৯৬.২	৮৮৩.৮৯	৯৫.৮	৩৩৭	১০৮.০	১,৮২২.১২	৯৪.২	৪৮৯	১০৪.০	২,৭০৬.০১	৯৪.৭
১৯৯৭-৯৮	১৫২	৯৬.২	৯০১.৩৯	৯৭.৭	৩২৫	১০৪.২	১,৮৩২.১২	৯৪.৭	৪৭৭	১০১.৫	২,৭৩৩.৫১	৯৫.৬
১৯৯৮-৯৯	১২৮	৮১.০	৯০১.৩৯	৯৭.৭	৩২৩	১০৩.৫	১,৮৩২.১২	৯৪.৭	৪৫১	৯৬.০	২,৭৩৩.৫১	৯৫.৬
১৯৯৯-২০০০	১৩০	৮২.৩	৯৩৬.২৫	১০১.৪	৩২৫	১০৪.২	১,৮৩২.১২	৯৪.৭	৪৫৫	৯৬.৮	২,৭৬৮.৩৭	৯৬.৯
২০০০-২০০১	১৩০	৮২.৩	৯৩৬.২৫	১০১.৪	৩২৯	১০৫.৪	১,৮৩২.১২	৯৪.৭	৪৫৯	৯৭.৭	২,৭৬৮.৩৭	৯৬.৯

উৎস *ঃ* লেখক কর্তৃক ১, ২, ৩, ৪, ও ৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

সারণী ৩ : বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং ষ্টক পরিস্থিতি, ১৯৬৯-২০০১ সময়ে

সংখ্যা, %, ১৯৬৯-৭০ = ১০০.০

বছর	লোকোমোটিভ				মোট	যাত্রীবাহী ওয়াগন			মালবাহী ওয়াগন		
		ব্রডগেজ	মিটারগেজ			যাত্রীবাহী	অন্যান্য	মোট	ইউনিট	ফোর	মোট
	ষ্টীম	ডিজেল	ষ্টীম	ডিজেল						হুইলার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৯৬৯-৭০	১২১	১৮	২২২	১২৫	৪৮৬	১,১৬৫	৪৭৮	১,৬৪৩	১৬,৮২৩	১৯,৬১৬	৩৬,৪৩৯
	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)
১৯৭২-৭৩	১১৫	৩৪	২২৩	১২৮	৫০০	১,১৯৫	৪৭৯	১,৬৭৪	১৬,১০০	১৮,৬৬৭	৩৪,৭৬৭
	(৯৫.০)	(১৮৮.৯)	(১০০.৫)	(১০২.৪)	(১০২.৯)	(১০২.৬)	(১০০.২)	(১০১.৯)	(৯৫.৭)	(৯৫.২)	(৯৫.৪)
১৯৭৪-৭৫	১১৫	৩৪	২০৩	১৫১	৫০৩	১,২০৭	৪০৮	১,৬১৫	১৫,৬২৬	১৭,৭৪২	৩৩,৩৬৮
	(৯৫.০)	(১৮৮.৯)	(৯১.৪)	(১২০.৮)	(১০৩.৫)	(১০৩.৬)	(৮৫.৪)	(৯৮.৩)	(৯২.৯)	(৯০.৪)	(৯১.৬)
১৯৮৯-৯০	-	৭৫		২৩২	৩০৭	১,৪৬৮	২০৩	১,৬৭১	১৫,৫৩৬	১৮,৬৭৪	৩৪,২১০
		(৪১৬.৭)	-	(১৮৫.৬)	(৬৩.২)	(১২৬.০)	(৪২.৫)	(১০১.৭)	(৯২.৩)	(৯৫.২)	(৯৩.৯)
১৯৯০-৯১	-	৭৫		২৩২	৩০৭	১,৪৩৬	১৯১	১,৬২৭	১৫,২৯৬	১৮,৪৩৬	৩৩,৭৩২
		(৪১৬.৭)	-	(১৮৫.৬)	(৬৩.২)	(১২৩.৩)	(৪০.০)	(৯৯.০)	(৯০.৯)	(৯৪.০)	(৯২.৬)
১৯৯১-৯২	-	৭৫		২৩৩	৩০৮	১,৪৩০	১৮৪	১,৬১৪	১৫,১৬২	১৮,২৯২	৩৩,৪৫৪
		(৪১৬.৭)	-	(১৮৬.৪)	(৬৩.৪)	(১২২.৭)	(৩৮.৫)	(৯৮.২)	(৯০.১)	(৯৩.৩)	(৯১.৮)
১৯৯২-৯৩	-	৭৩		২১৪	২৮৭	১,৩৭২	১৭২	১,৫৪৪	১৪,৭০৬	১৭,৭৭৭	৩২,৪৮৩
		(৪০৫.৬)	-	(১৭১.২)	(৫৯.১)	(১১৭.৮)	(৩৬.০)	(৯৪.০)	(৮৭.৪)	(৯০.৬)	(৮৯.১)
১৯৯৩-৯৪	-	৭১		২০৪	২৭৫	১,৩৫৯	১৫২	১,৫১১	১৪,৫৪৪	১৭,৬৮৪	৩২,২২৮
		(৩৯৪.৪)	-	(১৬৩.২)	(৫৬.৬)	(১১৬.৭)	(৩১.৮)	(৯২.০)	(৮৬.৫)	(৯০.২)	(৮৮.৪)
১৯৯৪-৯৫	-	৬৮		২১১	২৭৯	১,৩২৩	১৫৫	১,৪৭৮	১৪,৩৬৭	১৭,৪৯৮	৩১,৮৬৫
		(৩৭৭.৮)	-	(১৬৮.৮)	(৫৭.৪)	(১১৩.৬)	(৩২.৪)	(৯০.০)	(৮৫.৪)	(৮৯.২)	(৮৭.৪)
১৯৯৫-৯৬	-	৬৮		২০৪	২৭২	১,২৭৭	১৫৩	১,৪৩০	১৩,৮১৭	১৬,৯৪৮	৩০,৭৬৫
		(৩৭৭.৮)	-	(১৬৩.২)	(৫৬.০)	(১০৯.৬)	(৩২.০)	(৮৭.০)	(৮২.১)	(৮৬.৪)	(৮৪.৪)
১৯৯৬-৯৭	-	৬৮		২১৬	২৮৪	১,২৪৯	১৫২	১,৪০১	১২,৭৭৩	১৫,৯১৭	২৮,৬৯০
		(৩৭৭.৮)	-	(১৭২.৮)	(৫৮.৪)	(১০৭.২)	(৩১.৮)	(৮৫.৩)	(৭৫.৯)	(৮১.১)	(৭৮.৭)
১৯৯৭-৯৮	-	৬৮		২০৭	২৭৫	১,২৬৪	১৪৬	১,৪১০	১১,৯৪৩	১৫,০৭৩	২৭,০১৬
		(৩৭৭.৮)	-	(১৬৫.৬)	(৫৬.৬)	(১০৮.৫)	(৩০.৫)	(৮৫.৮)	(৭১.০)	(৭৬.৮)	(৭৪.১)
১৯৯৮-৯৯	-	৬৬		২১৩	২৭৯	১,২৮৭	১৩৯	১,৪২৬	১১,১৫২	১৪,২৪৭	২৫,৩৯৯
		(৩৬৬.৭)	-	(১৭০.৪)	(৫৭.৪)	(১১০.৫)	(২৯.১)	(৮৬.৮)	(৬৬.৩)	(৭২.৬)	(৬৯.৭)
১৯৯৯-২০০০	-	৬৬		২০২	২৬৮	১,২৮২	১৩৭	১,৪১৯	১০,৯২৯	১৩,৯৭৫	২৪,৯০৪
		(৩৬৬.৭)	-	(১৬১.৬)	(৫৫.১)	(১১০.০)	(২৮.৭)	(৮৬.৪)	(৬৫.০)	(৭১.২)	(৬৮.৩)
২০০০-২০০১	-	৭৫		২০২	২৭৭	১,২৭৫	১৩৬	১,৪১১	১০,৭৭৮	১৩,৭৫৫	২৪,৫৩৩
		(৪১৬.৭)	-	(১৬১.৬)	(৫৭.০)	(১০৯.৪)	(২৮.৫)	(৮৫.৯)	(৬৪.১)	(৭০.১)	(৬৭.৩)

উৎস *ঃ* লেখক কর্তৃক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

এর চেয়ে আরও বেশী অধঃপতন ঘটেছে রেলওয়ের রোলিং ষ্টকের ক্ষেত্রে (সারণী-৩) । সারণী-৩ এর তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, মালবাহী ওয়াগনের সংখ্যা ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ২০০০-২০০১ সালে প্রায় অর্ধেকে গিয়ে ঠেকেছে (১৯৬৯-৭০ সালে ছিল ৩৬,৪৩৯ টি এবং ২০০০-২০০১ এ মাত্র ২৪,৫৩৩ টি), অর্থাৎ এর সূচক নেমে মাত্র ৬৭.৩ এ গিয়ে দাঁড়ায় । যাত্রীবাহী ওয়াগনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভাল হলেও এর সূচকও হ্রাস পেয়ে ২০০০-২০০১ সালে ৮৫.৯ এ গিয়ে ঠেকে । রেলের ইঞ্জিন বা লোকোমোটিভের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একেবারে শোচনীয় ঃ ১৯৬৯-৭০ সালে যেখানে এর সংখ্যা ছিল ৪৮৬ টি ২০০০-২০০১ এ তা গিয়ে ঠেকে মাত্র ২৭৭ টিতে । এগুলোর আবার বেশীর ভাগই অত্যন্ত জড়াজীর্ণ এবং প্রায়ই দীর্ঘ সময়ের জন্যে মেরামতে পাঠাতে হয় । ১৯৬৯-৭০ এর তুলনায় লোকোমোটিভের সূচক হ্রাস পেয়ে মাত্র ৫৭.০ এ গিয়ে ঠেকে ।

এসবের একটা অনিবার্য প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব ও আর্থিক কার্যক্রমে (সারণী-৪) । সারণী-৪ এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭২-৭৩ এ দু'বছর ছাড়া বাকী বছরগুলোতে বাংলাদেশ রেলওয়ে লোকসান দিয়েছে এবং ক্রমাগতভাবে এ লোকসানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে । স্বাধীন বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের ইতিহাসে একমাত্র বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলে ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে লাভের মুখ দেখেছিলঃ ঐ বছর ১০.৮ মিলিয়ন টাকা লাভ করেছিল । ১৯৬৯-৭০ সালেও বাংলাদেশ রেলওয়ে লাভ করেছিল ৫০.২ মিলিয়ন টাকা । ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে লোকসান দিয়েছিল মাত্র ০৪.১ মিলিয়ন টাকা যা বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০০০-২০০১ সালে ১,৫৭৪.৮ মিলিয়নে গিয়ে ঠেকে । মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ বিপুল পরিমাণ লোকসানকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে পাবলিক সার্ভিস অব্লিগেশনের (পিএসও) নামে সরকার বাংলাদেশ রেলওয়েকে আসলে ভর্তুকী দিয়ে আসছে যার পরিমাণ ২০০০-২০০১ সালে ছিল ১,০১৬.৬ মিলিয়ন টাকা । সার্বিক বিবেচনায় একমাত্র ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭২-৭৩ এ দু'বছরই শুধু অপারেটিং রেশিও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকুলে ছিল । অন্যদিকে তিন দশকের ব্যবধানে যাত্রী পরিবহণ খাতে সবচেয়ে বেশী আয় করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ এ খাত থেকে যাত্রী প্রতি আয় প্রায় সাড়ে সাতাশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (২৭৫২.৯%), মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে যা ছিল মাত্র এগারো গুণের মত (১১২৪.৯%) । বাংলাদেশ রেলওয়ের এহেন দূরাবস্থার চিত্র আরও পরিস্কারভাবে বোঝা যায় তার সময়ানুবর্তিতার তথ্য থেকে । সারণী-৫ এ উপস্থাপিত এ সংক্রান্ত তথ্য থকে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যথাসময়ে গন্তব্যে পৌছাতে পারে নি এবং তিন দশকের ব্যবধানে অবস্থার মারাত্মক অবনতি হয়েছে । সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দেখা যাচ্ছে ব্রডগেজ্ মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রে ঃ ১৯৬৯-৭০ সালে যেখানে ৯০.৫% ট্রেন সময়মত গন্তব্যে পৌছাতে সমর্থ হয়, সেখানে ২০০০-২০০১ সালে তা মাত্র ৩০.২% এ গিয়ে ঠেকে । ব্রডগেজ্ লোকালের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ৯০.১% ও ৫৩.০% এবং ইন্টারসিটির ক্ষেত্রে তা ১৯৮৯-৯০ এর ৮০.৯% থেকে নেমে গিয়ে ২০০০-২০০১ সালে ৬৭.৯% এ পৌছায় । মিটারগেজ্ ট্রেনের ক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থার অতটা অবনতি হয় নি । এক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ৮৫.৭% (১৯৮৯-৯০) ও ৭৯.৮% (২০০০-২০০১); ৭২.৪% ও ৭১.১% এবং ৭৯.০% ও ৬৪.১% ।

সারণী ৪ : বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব ও আর্থিক কার্যক্রমের চিত্র, ১৯৬৯-২০০১ সময়ে

%, ১৯৬৯-৭০ = ১০০.০

বছর	আয়				মোট	মোট	মোট	নীট অপারেটিং আয়		
যাত্রী-কি:মি:	যাত্রী প্রতি প্রতি, পয়সা	টন-কিঃমিঃ টাকা	টন প্রতি প্রতি, পয়সা	অপারেটিং টাকা	অপারেটিং আয়, মিঃটঃ	অপারেটিং ব্যয় মিঃটঃ	অপারেটিং রেশিও%	পিএসও বা ভুর্তকী	পিএসও ভুর্তকীসহ	পিএসও ভুর্তকী ছাড়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৯৬৯-৭০	০৩.০৪	০১.৩৮	১২.৭	৩৩.৫৪	৩০৩.০	২৫২.৮	৮৩.০	-	-	৫০.২
	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)				
১৯৭২-৭৩	০৩.১৮	০১.৪১	১৭.৩৯	৪০.৩৮	২৪৬.৯	২৩৬.১	৯৫.৬	-	-	১০.৮
	(১০৪.৬)	(১০২.২)	(১৩৬.৯)	(১২০.৪)	(৮১.৫)	(৯৩.৪)				
১৯৭৪-৭৫	০৪.১৬	০২.১১	২৬.৪১	৫৬.৯০	৪০২.৭	৪০৭.১	১০১.১	-	-	-০৪.৩
	(১৩৬.৮)	(১৫২.৯)	(২০৭.৯)	(১৬৯.৬)	(১৩২.৯)	(১৬১.০)				
১৯৮৯-৯০	১৫.৭৪	১৫.০১	১২০.৪	৩৪৩.৬০	২,০৩০.১	৩,১৩৩.৪	১৫৪.৪	-	-	-১,১০৩.৩
	(৫১৭.৮)	(১০৮৭.৭)	(৯৪৮.০)	(১০২৪.৪)	(৬৭০.০)	(১২৩৯.৫)				
১৯৯০-৯১	১৯.৩৬	১৮.৭৭	১২৫.৪	৩৮৩.৪৫	২,৩৮২.৭	৩,৩৬৪.৫	১৪১.২	-	-	-৯৮১.৮
	(৬৩৬.৮)	(১৩৬০.১)	(৯৮৭.৪)	(১১৪৩.৩)	(৭৮৬.৪)	(১৩৩০.৯)				
১৯৯১-৯২	২০.৫২	২১.৫৩	১২৯.৮	৪২৮.২৬	২,৬০৩.৬	৩,৩৯৭.৭	১৩০.৫	-	-	-৭৯৪.১
	(৬৭৫.০)	(১৫৬০.১)	(১০২২.০)	(১২৭৬.৯)	(৮৫৯.৩)	(১৩৪৪.০)				
১৯৯২-৯৩	২১.৫৭	২২.৩৫	১৩০.৭	৩৮১.৪৪	২,৯৮০.৭	৩,৮১৭.০	১২৮.১	৯৩০.৫	+৯৪.২	-৮৩৬.৩
	(৭০৯.৫)	(১৬১৯.৬)	(১০২৯.১)	(১১৩৭.৩)	(৯৮৩.৭)	(১৫০৯.৯)				
১৯৯৩-৯৪	২২.৮১	২৩.৮৪	১৩০.০	৩৫২.০৫	২,৭৪২.১	৩,৭৪২.৮	১৩৬.৫	৮৯৬.৩	-১০৪.৪	-১,০০০.৭
	(৭৫০.৩)	(১৭২৭.৫)	(১০২৩.৬)	(১০৪৯.৬)	(৯০৪.৯)	(১৪৮০.৫)				
১৯৯৪-৯৫	২২.৬১	২৩.৪৭	১৩৭.১	৪২৮.৯৭	২,৯৪৬.৮	৩,৯০৪.৬	১৩২.৫	৯৬৭.৮	+৯.৯	-৯৫৭.৮
	(৭৪৩.৮)	(১৭০০.৭)	(১০৭৯.৫)	(১২৭৮.৯)	(৯৭২.৫)	(১৫৪৪.৫)				
১৯৯৫-৯৬	২৫.৩৫	২৬.৩৩	১৪০.৫	৪৩৩.০১	২,৮৪০.৯	৪,০১৫.৮	১৪১.৪	১,১১২.৭	-৬২.২	-১,১৭৪.৯
	(৮৩৩.৯)	(১৯০৭.৯)	(১১০৬.৩)	(১২৯১.০)	(৯৩৭.৬)	(১৫৮৮.৫)				
১৯৯৬-৯৭	২৬.২৯	২৬.৭৭	১২৩.৬	৩৫৩.৭৪	৩,৩০৬.৪	৪,১৪১.৬	১২৫.৩	১,০২০.৭	+১৮৫.৪	-৮৩৫.২
	(৮৬৪.৮)	(১৯৩৯.৯)	(৯৭৩.২)	(১০৫৪.৭)	(১০৯১.২)	(১৬৩৮.৩)				
১৯৯৭-৯৮	২৮.৬১	২৯.২৫	১৩৮.৮	৩৮৮.৬৯	৩,৫০৯.০	৪,৩৩৩.৬	১২৩.৫	১,০০৯.৪	+১৮৪.৭	-৮২৪.৬
	(৯৪১.১)	(২১১৯.৬)	(১০৯২.৯)	(১১৫৮.৯)	(১১৫৮.০)	(১৭১৪.২)				
১৯৯৮-৯৯	৩৪.৬৩	৩৬.২৩	১৪২.৪	৩৯৬.০৪	৩,৭৪২.৬	৪,৬১১.৫	১২৩.২	১,০১৩.৩	+১৪৪.৪	-৮৬৮.৯
	(১১৩৯.১)	(২৬২৫.৪)	(১১২১.৩)	(১১৮০.৮)	(১২৩৫.২)	(১৮২৪.২)				
১৯৯৯-২০০০	৩৫.৭৯	৩৭.৭৪	১৪৭.০	৪০৯.৬৯	৩,৪১৪.৯	৪,৬৯৮.৬	১৩৭.৬	১,০১৬.১	-২৬৭.৫	-১,২৮৩.৭
	(১১৭৭.৩)	(২৭৩৪.৮)	(১১৫৭.৫)	(১২২১.৫)	(১১২৭.০)	(১৮৫৮.৬)				
২০০০-২০০১	৩৫.৯৩	৩৭.৯৯	১৩৮.১	৩৭৭.২৮	৩,৬৬৩.৯	৫,২৩৮.৭	১৪২.৯	১,০১৬.৬	-৫৫৮.২	-১,৫৭৪.৮
	(১১৮১.৯)	(২৭৫২.৯)	(১০৮৭.৪)	(১১২৪.৯)	(১২০৯.২)	(২০৭২.৩)				

* পিএসও হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস অব্লিগেশন।

উৎসঃ লেখক কর্তৃক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

বিগত তিন দশকের ব্যবধানে ট্রেনপ্রতি মাল পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও, বাড়েনি ট্রেনের গতি ও ট্রেনপ্রতি ওয়াগন সংখ্যা (সারণী-৬)। সারণী-৬ এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ব্রডগেজ্ লাইনের মালবাহী ট্রেনের নীট মাল বহনের পরিমাণ ঐ সময়ে দেড়গুনেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে (১৬৬.৬%)ঃ

সারণী ৫ : বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রীবাহী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার চিত্র, ১৯৬৯-২০০১ সময়ে %*

বছর	ব্রডগেজ্			মিটার গেজ্		
	ইন্টারসিটি ট্রেন	মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেন	লোকাল ট্রেন	ইন্টারসিটি ট্রেন	মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেন	লোকাল ট্রেন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৬৯-৭০	-	৯০.৫	৯০.১**	-	৭২.৪	৭৯.০
১৯৮৯-৯০	৮০.৯	৫৭.০	৩৮.৬	৮৫.৭	৭১.১	৬২.৫
১৯৯০-৯১	৬৫.৮	৫২.৭	২৬.৭	৭৮.৮	৬২.১	৬১.২
১৯৯১-৯২	৭৪.৬	৫২.৩	৩৫.৩	৮৪.৩	৭০.১	৬১.১
১৯৯২-৯৩	৮৩.১	৬৬.৩	৪৮.২	৮১.০	৬৫.৭	৬৬.২
১৯৯৩-৯৪	৮৩.৮	৭৩.০	৫৪.৮	৭৯.৮	৭০.৬	৬৯.১
১৯৯৪-৯৫	৭৭.৬	৫৭.৫	৪৪.৩	৭১.৭	৬০.৬	৬১.২
১৯৯৫-৯৬	৭৫.৫	৪৮.৬	৪২.৬	৭৮.১	৬১.৬	৫৮.৮
১৯৯৬-৯৭	৮০.৯	৫৩.৪	৪৬.৬	৮৬.৯	৭৪.৫	৬৬.৬
১৯৯৭-৯৮	৬৯.৫	৪৩.৩	৪০.১	৮৫.৪	৭২.৭	৬১.৮
১৯৯৮-৯৯	৫৭.৪	১৫.৪	২২.৫	৬৮.৮	৫৭.০	৬২.৩
১৯৯৯-২০০০	৬১.৭	৩০.৬	৬৫.৯	৭৫.৮	৬২.৭	৬১.৩
২০০০-২০০১	৬৭.৯	৩৪.২	৫৩.০	৭৯.৮	৭১.১	৬৪.১

* মোট ট্রেনের মধ্যে সময়মত গন্তব্য পৌছানোর হার।

** ১৯৬৯-৭০ এর ক্ষেত্রে মিক্সড্ ও অন্যান্য ট্রেনের অংক লোকাল ট্রেনের মধ্যে ধরা হয়েছে।

উৎসঃ লেখক কর্তৃক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

১৯৬৯-৭০ সালের ৩৩৮.০ টন থেকে বেড়ে ২০০০-২০০১ এ ৫৬৩.০ টনে গিয়ে দাঁড়ায়। মিটারগেজ্ ট্রেনে অবশ্য অতটা বাড়ে নি (১৩৭.২%)। অথচ ব্রডগেজ্ ও মিটারগেজ্ উভয় ক্ষেত্রেই ট্রেনপ্রতি ওয়াগন সংখ্যা ও ট্রেনের গড় গতি প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে এ সময়ে। অপরদিকে যাত্রীবাহী ট্রেনে ব্রডগেজ্ ও মিটারগেজ্ উভয় লাইনেই ইন্টারসিটির ওয়াগন সংখ্যা এ সময়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ ব্রডগ্রেজের ক্ষেত্রে ১৯৮৯-৯০ এর ১৬.১ টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০-২০০১ সালে ১৭.৬ টি হয়েছে এবং মিটারগেজের ক্ষেত্রে এ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ২৩.৫ টি ও ২৮.৬ টি (সারণী-৭)। মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে ঃ ব্রডগেজের ক্ষেত্রে ১৯৬৯-৭০ এর ১৪.৭ টি থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০০-২০০১ এ ১০.৯ টিতে দাঁড়ায় এবং মিটারগেজের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিলো যথাক্রমে ১৯.৭৫টি ও ১৭.৭ টি। অন্যান্য ট্রেনের ক্ষেত্রে ওয়াগন সংখ্যার তেমন কোনও পরিবর্তন হয় নি এ সময়ে।

সারণী ৬ : বাংলাদেশ রেলওয়ের মালগাড়ির গতি ও মালবহনের চিত্র, ১৯৬৯-২০০১ সময়ে

%, ১৯৬৯-৭০ = ১০০.০

বছর	*ব্রড গেজ*				*মিটার গেজ*			
	ট্রেন প্রতি ওয়াগন সংখ্যা	গড় গতি, কিঃমিঃ/ঘন্টা	ওয়াগন প্রতি গড়ে মালবহনের পরিমাণ, টন	ট্রেন প্রতি নীট মালবহনের পরিমাণ, টন	ট্রেন প্রতি ওয়াগন সংখ্যা	গড় গতি, কিঃমিঃ/ঘন্টা	ওয়াগন প্রতি গড়ে মালবহনের পরিমাণ, টন	ট্রেন প্রতি নীট মালবহনের পরিমাণ, টন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৯৬৯-৭০	৪১.৯	০৯.১৪	১৩.৭	৩৩৮.০	৫০.১	১০.৫০	০৯.৩	৩২০.০
	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)
১৯৮৯-৯০	৪৪.৩	১০.৪০	১৮.০	৪৮২.০	৪৬.৭	০৯.৯৮	১১.৮	৩৮২.০
	(১০৫.৭)	(১১৩.৮)	(১৩১.৪)	(১৪২.৬)	(৯৩.২)	(৯৫.০)	(১২৬.৯)	(১১৯.৪)
১৯৯০-৯১	৪৪.৩	১০.৬০	১৮.৩	৫০৫.০	৪৬.৫	১০.১০	১৩.১	৪৩৯.০
	(১০৫.৭)	(১১৫.৯)	(১৩৩.৬)	(১৪৯.৪)	(৯২.৮)	(৯৬.২)	(১৪০.৯)	(১৩৭.২)
১৯৯১-৯২	৪২.২	১০.৮০	১৮.৯	৫০১.০	৪৭.৮	১০.৯০	১৩.৫	৪৭৮.০
	(১০০.৭)	(১১৮.২)	(১৩৭.৯)	(১৪৮.২)	(৯৫.৪)	(১০৩.৮)	(১৪৫.২)	(১৪৯.৪)
১৯৯২-৯৩	৩৮.৭	১০.৭০	১৭.৫	৪১৭.০	৪৫.০	১১.৩০	১২.৫	৪২৮.০
	(৯২.৪)	(১১৭.১)	(১২৭.৭)	(১২৩.৪)	(৮৯.৮)	(১০৭.৬)	(১৩৪.৪)	(১৩৩.৮)
১৯৯৩-৯৪	৩৭.৮	১০.৭০	১৮.২	৪০৯	৪৪.২	১১.৬০	১৩.২	৪২৫.০
	(৯০.২)	(১১৭.১)	(১৩২.৮)	(১২১.০)	(৮৮.২)	(১১০.৫)	(১৪১.৯)	(১৩২.৮)
১৯৯৪-৯৫	৩৯.৬	১০.৫০	১৮.৬	৪৫৯.০	৪৫.৬	১২.০০	১৩.০	৪৩৯.০
	(৯৪.৫)	(১১৪.৯)	(১৩৫.৮)	(১৩৫.৮)	(৯১.০)	(১১৪.৩)	(১৩৯.৮)	(১৩৭.২)
১৯৯৫-৯৬	৩৯.৯	১০.৬০	১৮.২	৪৩৭.০	৪৬.১	১২.০০	১৩.২	৪৪৮.০
	(৯৫.২)	(১১৫.৯)	(১৩২.৮)	(১২৯.৩)	(৯২.০)	(১১৪.৩)	(১৪১.৯)	(১৪০.০)
১৯৯৬-৯৭	৪৩.৭	১০.৭০	২৩.০	৫৫০.০	৪৩.১	১২.৭০	১৪.২	৪৫৪.০
	(১০৪.৩)	(১১৭.১)	(১৬৭.৯)	(১৬২.৭)	(৮৬.০)	(১২০.৯)	(১৫২.৭)	(১৪১.৯)
১৯৯৭-৯৮	৪৪.৮	১০.৯০	২১.৫	৫৫০.০	৪৮.২	১২.৩০	১২.৬	৪৪৭.০
	(১০৬.৯)	(১১৯.৩)	(১৫৬.৯)	(১৬২.৭)	(৯৬.২)	(১১৭.১)	(১৩৫.৫)	(১৩৯.৭)
১৯৯৮-৯৯	৪৫.৫	১১.০০	২২.৫	৫৫০.০	৪৯.৬	১২.৩০	১৩.১	৪৮৫.০
	১০৮.৬)	(১২০.৪)	(১৬৪.২)	(১৬২.৭)	(৯৯.০)	(১১৭.১)	(১৪০.৯)	(১৫১.৬)
১৯৯৯-২০০০	৪৩.১	১০.৮০	২১.১	৪৭৪.০	৪৮.২	১২.৪০	১২.৪	৪২৮.০
	(১০২.৯)	(১১৮.২)	(১৫৪.০)	(১৪০.২)	(৯৬.২)	(১১৮.১)	(১৩৩.৩)	(১৩৩.৮)
২০০০-২০০১	৪১.৫	১০.৬০	২৪.৯	৫৬৩.০	৪৭.৮	১০.৮০	১১.৭	৪৩৯.০
	(৯৯.১)	(১১৫.৯)	(১৮১.৮)	(১৬৬.৬)	(৯৫.৪)	(১০২.৯)	(১২৫.৮)	(১৩৭.২)

উৎসঃ লেখক কর্তৃক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত ।

সারণী ৭ : বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন ধরনের যাত্রীবাহী ট্রেনে গড় ওয়াগন সংখ্যার চিত্র, ১৯৬৯-২০০১ সময়ে

বছর	ব্রডগেজ্ ট্রেনের ধরণ					মিটারগেজ্ ট্রেনের ধরণ				
	ইন্টারসিটি	মেইল ও এক্সপ্রেস	লোকাল	মোট	মালবাহী ওয়াগন	ইন্টারসিটি	মেইল ও এক্সপ্রেস	লোকাল	মোট	মালবাহী ওয়াগন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৯৬৯-৭০	-	১৭.৪*	১৪.৭*	-	৪.৫১*	-	১৯.৭৫*	১৩.৭*	-	১.৮৫*
১৯৮৯-৯০	-	১৪.১*	১৪.২*	-	১.৮০*	-	১৭.৩*	১২.৪*	-	৪.৪৮*
১৯৯০-৯১	১৬.১	১৭.৫	১২.২	১৪.৭	০.৩০	২৩.৫	১৬.৫	১৪.৫	১৭.৭	০.৪৬
১৯৯১-৯২	১৬.৩	১৫.৫	১১.৯	১৪.৩	০.৩৭	২৫.০	১৮.৪	১২.৬	১৮.০	০.৫৭
১৯৯২-৯৩	১৫.৭	১৬.২	১১.৫	১৪.০	১.১৫	২৬.১	১৯.১	১২.২	১৮.৬	০.৭৬
১৯৯৩-৯৪	১৭.১	১৭.৬	১২.১	১৫.১	১.৩৪	২৬.৭	১৮.৭	১১.৪	১৮.৩	০.৮৭
১৯৯৪-৯৫	১৬.৪	১৪.৩	০৯.৬৪	১৩.০	১.১২	২৬.৭	১৮.১	১১.৩	১৮.০	০.৯১
১৯৯৫-৯৬	১৬.৭	১৬.১	১০.১	১৩.৮	১.৩৩	২৭.৫	১৬.৪	১০.৯	১৭.৪	০.৫৭
১৯৯৬-৯৭	১৭.৩	১৩.৯	০৯.৮৯	১৩.৩	০.৬৭	২৬.৪	১৭.৮	১১.৩	১৭.৬	০.৯৪
১৯৯৭-৯৮	১৭.৬	১৩.২	১০.২	১৩.৬	০.৭৪	২৮.২	১৭.৯	১১.১	১৮.২	১.০০
১৯৯৮-৯৯	১৭.৮	১৩.৬	১০.১	১৪.৩	১.১৫	২৯.০	১৮.২	১১.২	১৮.৮	০.৯৫
১৯৯৯-২০০০	১৭.৫	১৩.৫	১০.১	১৪.৫	০.৯২	২৮.০	১৬.৪	১০.৯	১৮.৪	০.৮৮
২০০০-২০০১	১৭.৬	১৩.৯	১০.৯	১৪.৮	১.১২	২৮.৬	১৭.৭	১০.২	১৮.৭	০.৯৭

* ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত শুধু দু'ধরনের যাত্রীবাহী ট্রেন চালু ছিল ঃ যাত্রীবাহী এবং মিক্সড্। সেজন্য ৩ ও ৮নং ঘরে যাত্রীবাহী এবং ৪ ও ৯ নং ঘরে মিক্সড ট্রেন দেখানো হয়েছে। যদিও ১৯৮৫ সালে ট্রেনের ধরণ পরিবর্তন করা হয় এবং ইন্টারসিটি ট্রেন চালু করা হয়, তথাপি ১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত আলাদা তথ্য দেখানো হয় নি। কাজেই ১৯৮৯-৯০ এর তথ্যও ১৯৬৯-৭০ এর মত পূর্বোল্লেখিত কলাম বা ঘরেই দেখানো হয়েছে।

উৎসঃ লেখক কর্তৃক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

বাংলাদেশ রেলওয়ের দূরাবস্থার চিত্র আরও পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠে এর দুর্ঘটার ব্যাপকতা থেকে (সারণী-৮)। ১৯৯০-৯১ থেকে ২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায় এক দশকের ব্যবধানে ট্রেন দুর্ঘটনার হার প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ ১৯৯০-৯১ এর ২৩১ টি থেকে বেড়ে ২০০০-২০০১ সালে ৫৫২ টি হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, লাইনচ্যুতির কারনে সবচেয়ে বেশী দুর্ঘটনা ঘটেছে (শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ) এবং গোটা দশকজুড়ে এ অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিতই ছিল বলা যায় (৮৪.৯%-৯৫.৪% এর মধ্যে ঘুড়পাক খেয়েছে)। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল সংঘর্ষজনিত কারণ (০০.৯%-১০.৫%) এবং তৃতীয় স্থানে ছিল বাধাপ্রাপ্ততাজনিত কারণ (০০.৪%-১৩.৭%)। সুতরাং উপরে বর্ণিত তথ্য থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মূলতঃ লাইনের জড়াজীর্ণতার কারনেই এত বেশী দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এত খারাপ খবরের মাঝেও বাংলাদেশ রেলওয়ে কন্টেইনার সার্ভিসের ক্ষেত্রে অনেকটাই ভাল করছে (সারণী-৯)। বিগত শতাব্দীর আশি এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এ সার্ভিস চালু হয় একমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর ও ঢাকার মধ্যে এবং দ্রুত এটা জনপ্রিয়তা পায়। তার প্রমান পাই আমরা সারণী-৯ এর তথ্য থেকে। শুধুমাত্র ঐ শতাব্দীর নব্বই এর দশকে কন্টেইনার পরিবহণের প্রবৃদ্ধি ঘটে প্রায় সাড়ে নয় গুণ (৯৪৯.৪%)। আর এসব কন্টেইনারে নীট পণ্য পরিবহণের প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় পাঁচগুণ (৫১১.২%) এবং আয় বৃদ্ধি পায় প্রায় সাড়ে চার গুণ (৪৩০.৬%)।

বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত আমাদের উপরোক্ত বিশ্লেষনের প্রেক্ষিতে আমরা নিঃসন্দেহে এ উপসংহারে পৌছাতে পারি যে, এ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের অর্থনীতির পরিবহণ চাহিদা মেটাতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কি কারণে এমনটা ঘটলো? রেলওয়ের সমস্যাগুলো কি? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো আমরা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সমস্যাসমূহ ও তার সমাধান

বাংলাদেশ রেলওয়ের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনায় আমাদের মনে হয়েছে যে, এর সমস্যাগুলো অত্যন্ত জটিল এবং বহুমাত্রিক। কাজেই এগুলোর সমাধানও হবে অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। কিন্তু সমাধান সম্ভব এবং অত্যাবশ্যক দেশের এবং জনগণের সার্বিক স্বার্থের বিবেচনায়। আমাদের মতে বাংলাদেশ রেলওয়ের সমস্যাগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১। লাইনের সমস্যা;
২। রোলিং স্টকের সমস্যা;
৩। ব্যবস্থাপনার সমস্যা;
৪। দুর্নীতির সমস্যা;
৫। আধুনিকায়নের সমস্যা।

লাইনের সমস্যা দ্বিবিধ ঃ ক) দৈর্ঘ্যের অপ্রতুলতা; খ) জড়াজির্ণ অবস্থা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ভূখন্ডে যেটুকুন লাইন নির্মিত হয়েছে তার সিংহভাগই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐপনিবেশিক আমলে হয়েছে। পাকি নব্য-উপনিবেশী আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ৩৩ বছরে অতি সামান্যই হয়েছে (সারণী-১, সারণী-৯)। লক্ষ্যনীয় যে, বেনীয়া বৃটিশরা শুধু তাদের বানিজ্যিক স্বার্থেই যেখানে

সারণী ৮ : বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেন দুর্ঘটনার চিত্র, ১৯৯০-২০০১ সময়ে

%, ১৯৯০-৯১ = ১০০.০

বছর		দুর্ঘটনার কারণসমূহ								মোট	ক্ষতির
		সংঘর্ষ		লাইনচ্যুতি		আগুণ		বাধাপ্রাপ্ত	সংখ্যা	অংশ	পরিমাণ,
	সংখ্যা	অংশ	সংখ্যা	অংশ	সংখ্যা	অংশ	সংখ্যা	অংশ			মিঃ টাঃ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৯৯০-৯১	১১	০৪.৮	২১৪	৯২.৬	-	০০.০	০৬	০২.৬	২৩১	১০০.০	২১.৫
	(১০০.০)		(১০০.০)		(০০.০)		(১০০.০)		(১০০.০)		(১০০.০)
১৯৯১-৯২	২৬	১০.৫	২১৫	৮৬.৩	০১	০০.৪	০৭	০২.৮	২৪৯	১০০.০	১৫.৭
	(২৩৬.৪)		(১০০.৫)		(১০০.০)		(১১৬.৭)		(১০৭.৮)		(৭৩.০)
১৯৯২-৯৩	১১	০৪.৭	২১৯	৯৪.০	০২	০০.৯	০১	০০.৪	২৩৩	১০০.০	০১.০
	(১০০.০)		(১০২.৩)		(২০০.০)		(১৬.৭)		(১০০.৯)		(০৪.৬)
১৯৯৩-৯৪	১২	০৩.২	৩৫৯	৯৫.০	-	০০.০	০৭	০১.৮	৩৭৮	১০০.০	১০.৩
	(১০৯.১)		(১৬৭.৮)		(০০.০)		(১১৬.৭)		(১৬৩.৬)		(৪৭.৯)
১৯৯৪-৯৫	০৯	০৩.১	২৭৫	৯৪.২	০১	০০.৩	০৭	০২.৪	২৯২	১০০.০	০৬.৪
	(৮১.৮)		(১২৮.৫)		(১০০.০)		(১১৬.৭)		(১২৬.৪)		(২৯.৮)
১৯৯৫-৯৬	০৮	০৩.৩	২২৮	৯৫.৪	-	০০.০	০৩.	০১.৩	২৩৯	১০০.০	০৪.৮
	(৭২.৭)		(১০৬.৫)		(০০.০)		(৫০.০)		(১০৩.৫)		(২২.৩)
১৯৯৬-৯৭	০৯	০২.২	৩৮৯	৯৪.২	-	০০.০	১৫	০৩.৬	৪১৩	১০০.০	০২.৩
	(৮১.৮)		(১৮১.৮)		(০০.০)		(২৫০.০)		(১৭৮.৮		(১০.৭)
১৯৯৭-৯৮	০৮	০৩.১	২৩৩	৯০.৭	-	০০.০	১৬	০৬.২	২৫৭	১০০.০	০৮.৬
	(৭২.৭)		(১০৮.৯)		(০০.০)		(২৬৬.৭)		(১১১.৩)		(৪০.০)
১৯৯৮-৯৯	০৫	০১.৪	৩০৪	৮৪.৯	-	০০.০	৪৯	১৩.৭	৩৫৮	১০০.০	০২.৬
	(৪৫.৫)		(১৪২.১)		(০০.০)		(৮১৬.৭)		(১৫৫.০)		(১২.১)
১৯৯৯-২০০০	০৬	০১.৩	৪০৫	৮৮.৮	০১	০০.২	৪৪	০৯.৭	৪৫৬	১০০.০	০৪.৬
	(৫৪.৫)		(১৮৯.৩)		(১০০.০)		(৭৩৩.৩)		(১৯৭.৪)		(২১.৪)
২০০০-২০০১	০৫	০০.৯	৫১০	৯২.৪	-	০০.০	৩৭	০৬.৭	৫৫২	১০০.০	১৩.৬
	(৪৫.৫)		(২৩৮.৩)		(০০.০)		(৬১৬.৭)		(২৩৯.০)		(৬৩.৩)

উৎসঃ লেখক কর্তৃক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকুনই নির্মাণ করেছে (সারণী-৯) । বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে মাত্র ৪৪টি জেলাতে অনেকটা নামকা ওয়াস্তে রেল লাইন আছে । তাও আবার অত্যন্ত বৈষম্যপূর্ণ বা অসমভাবে বিস্তৃত । সারণী-৯ এর তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ১০০ কিঃ মিঃ এর বেশী অথচ ২০০ কিঃ মিঃ এর কম রেল লাইন আছে এ রকম জেলার সংখ্যা মাত্র ৬ টি । আর ৫০-১০০ কিঃ মিঃ রেল লাইন আছে এমন জেলার সংখ্যা মাত্র ১৮ টি । আর বাকী ২০ টি জেলার রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ৫০ কিঃ মিঃ এর কম যার মধ্যে ১ টি জেলা আছে যার রেল লাইনের দৈর্ঘ্য মাত্র ৫ কিঃ মিঃ এবং অন্য একটির মাত্র সাড়ে নয় কিঃ মিঃ । এ লাইনগুলোর মধ্যে আবার বেশীর ভাগই সিঙ্গল লাইন । কাজেই লাইনের দৈর্ঘ্য একেবারেই অপ্রতুল । এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বাংলাদেশের অন্ততঃ ২০ টি জেলায় রেলের ছোঁয়া লাগে নি এটা ভাবাও যায় না । লাইন যা আছে তাও আবার অত্যন্ত জড়াজির্ণ এবং নড়বড়ে । পাথর ও স্লিপারের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে । এসব কারণে ট্রেনগুলোকে বাধ্য হয়েই ঝুঁকি এড়াতে অনেকটা গরুর গাড়ীর গতিতে চলতে হচ্ছে (সারণী-৬) ।

বাংলাদেশ রেলওয়েতে রোলিং স্টকের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট । বেশীরভাগ লোকোমোটিভই মেয়াদোত্তীর্ণ এবং জড়াজির্ণ এবং শত শত বার মেরামত করে চালানো হচ্ছে । ওয়াগন সমস্যাও গুরুতর । ইঞ্জিন ও ওয়াগনের অপ্রতুলতার কারণে ট্রেনের সংখ্যা (রেইস) বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না চাহিদা থাকা সত্ত্বেও । তরল পদার্থ বিশেষ করে তেল পরিবহণের জন্যে ট্যাংকারেরও রয়েছে প্রকট সংকট । ইঞ্জিন বা লোকোমোটিভগুলো জড়াজির্ণ হওয়াতে বাধ্য হয়েই স্বল্প গতিতে চালাতে হচ্ছে ট্রেন । এতে করে সময় বেশী লাগছে গন্তব্যে পৌছাতে এবং ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যার প্রভাব অবধারিতভাবে পড়ছে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ভাড়ার উপর - বৃদ্ধি পাচ্ছে ভাড়া । ওয়াগনগুলো জড়াগ্রস্থ হওয়াতে যাত্রীসেবার মান হচ্ছে নিম্নগামী । ফলে ট্রেনের প্রতি জনগনের আস্থা নষ্ট হচ্ছে ।

ব্যবস্থাপনার সমস্যা বাংলাদেশ রেলওয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । মূলতঃ এ সমস্যর কারণেই রেলওয়ের অন্যান্য সমস্যাগুলো প্রকটতর হয়েছে । রেলের জন্যে পৃথক মন্ত্রনালয় থাকা উচিত ছিল । পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিশেষ করে যেসকল দেশ রেল পরিবহণের উপর অধিক গরুত্ব দিয়েছে তাদের পৃথক রেল মন্ত্রনালয় আছে । আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও আলাদা রেল মন্ত্রনালয় আছে এবং আলাদা বাজেটের ব্যবস্থা আছে । রেলওয়ে বিভাগ যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের নেক্ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই । ১৯৮২ সালের ২-রা জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্যবস্থাপনা একটি বোর্ডের উপর (রেলওয়ে বোর্ড) ন্যাস্ত ছিল । তৎকালীন সামরিক সরকার (এরশাদের) ৩-রা জুন ১৯৮২ সালে রেলওয়ে বোর্ড বিলুপ্ত করে দেয় । আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ আরও পাকাপোক্ত করার জন্যে রেলওয়েকে যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ করা হয় "রেলওয়ে বিভাগ" নামে । রেলওয়ে বিভাগের সচিব পদাধিকার বলে হন এর মহাপরিচালক । বাংলাদেশ রেলওয়েকে দু'টি জোনে ভাগ করা হয় ঃ পূর্ব ও পশ্চিম । দু'জন জেনারেল ম্যানেজারের উপর ন্যাস্ত হয় দুজোনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব । তারা মহাপরিচালকের (ডাইরেক্টর জেনারেল) কাছে তাদের কাজের জন্যে দায়বদ্ধ থাকেন । নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি এসে আবার শুরু হয় এক্সপেরিমেন্ট । ১২-ই আগষ্ট ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে রেলের দৈনন্দিন কর্মকান্ডকে মন্ত্রনালয় থেকে আলাদা করে ডাইরেক্টর জেনারেলের উপর ন্যাস্ত করা হয় । ডাইরেক্টর জেনারেলকে রেলওয়ের কর্তাব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিয়োগদানের নিয়ম চালু হয় । ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ৯ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ রেলওয়ে অথরিটি নামে একটি নতুন পরিচালনা সংস্থা গঠিত হয় । এবারে পদাধিকার বলে যোগাযোগ মন্ত্রী হন

*সারণী ৯ : বাংলাদেশ রেলওয়ের কন্টেইনার সার্ভিসের চিত্র, ১৯৯০-২০০১ সময়ে**

%, ১৯৯০-৯১ = ১০০.০

বছর	চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকা আইসিডি	ঢাকা আইসিডি থেকে চট্টগ্রাম বন্দর			মোট	চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকা আইসিডি, টন	ঢাকা আইসিডি থেকে চট্টগ্রাম বন্দর, টন	মোট, টন	আয়, মিঃ টাকা
	মালভর্তি	খালি	মালভর্তি	খালি					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৯০-৯১	১,৯৫০	৮৫৮	১,৬৪৭	১,১০০	৫,৫৫৫	-	-	-	-
	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)				
১৯৯১-৯২	২,৬৫৬	১,৮৬৯	৩,১৭৫	৯৬৮	৮,৬৬৮	-	-	-	-
	(১৩৬.২)	(২১৭.৮)	(১৯২.৮)	(৮৮.০)	(১৫৬.০)				
১৯৯২-৯৩	৪,৮৩৭	২,১১৪	৪,৯৬১	১,৮৩২	১৩,৭৪৪	৪৯,০৫৪	২৬,৭৭৩	৭৫,৮২৭	৬৮.৩
	(২৪৮.১)	(২৪৬.৪)	(৩০১.২)	(১৬৬.৫)	(২৪৭.৪)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)
১৯৯৩-৯৪	৫,৬১৪	২,০২৭	৫,০১৯	২,৩৫০	১৫,০১০	৫৩,৬৭৮	২৯,২৮৯	৮২,৯৬৭	৭৭.৪
	(২৮৭.৯)	(২৩৬.২)	(৩০৪.৭)	(২১৩.৬)	(২৭০.২)	(১০৯.৪)	(১০৯.৪)	(১০৯.৪)	(১১৩.৩)
১৯৯৪-৯৫	৮,৮৬৮	২,০৭৯	৭,০৭১	৩,৭৩৯	২১,৭৫৭	৮৬,৭৪৯	৪৬,৫৯৫	১৩৩,৩৪৪	১১০.২
	(৪৫৪.৮)	(২৪২.৩)	(৪২৯.৩)	(৩৩৯.৯)	(৩৯১.৭)	(১৭৬.৮)	(১৭৪.০)	(১৭৫.৯)	(১৬১.৩)
১৯৯৫-৯৬	১০,৭২৬	২,২৮৫	৭,৭২৪	৪,৭০১	২৫,৪৩৬	১০৪,৮৫০	৫৯,২২৭	১৬৪,০৭৭	১৩১.৫
	(৫৫০.১)	(২৬৬.৩)	(৪৬৯.০)	(৪২৭.৪)	(৪৫৭.৯)	(২১৩.৭)	(২২১.২)	(২১৬.৪)	(১৯২.৫)
১৯৯৬-৯৭	১১,৯৯৪	২,৯৪০	৭,৯৮১	৭,০৩৮	২৯,৯৫৩	১২০,৮৩৪	৭১,০৫৩	১৯১,৮৮৭	১৪৫.২
	(৬১৫.১)	(৩৪২.৭)	(৪৮৪.৬)	(৬৩৯.৮)	(৫৩৯.২)	(২৪৬.৩)	(২৬৫.৪)	(২৫৩.১)	(২১২.৬)
১৯৯৭-৯৮	১৪,৬১১	২,৩৮০	৯,২৭২	৭,৩৮০	৩৩,৬৪৩	১৫০,৩৫৬	৮৫,৭৮১	২৩৬,১৩৭	১৬৭.১
	(৭৪৯.৩)	(২৭৭.৪)	(৫৬৩.০)	(৬৭০.৯)	(৬০৫.৬)	(৩০৬.৫)	(৩২০.৪)	(৩১১.৪)	(২৪৪.৭)
১৯৯৮-৯৯	১৭,৭৫০	১,৮৫৭	১১,০০৯	৭,৮১০	৩৮,৪২৬	২০৫,৭৫১	৯৭,৮০০	৩০৩,৫৫১	২০৭.৩
	(৯১০.৩)	(২১৬.৪)	(৬৬৮.৪)	(৭১০.০)	(৬৯১.৭)	(৪১৯.৪)	(৩৬৫.৩)	(৪০০.৩)	(৩০৩.৫)
১৯৯৯-২০০০	২১,৮৯৯	১,১৫৬	১২,০১৭	১০,৫৪৯	৪৫,৬২১	২৩৯,৫২৮	১১৫,৬৩৫	৩৫৫,১৬৩	২৬৪.৭
	(১১২৩.০)	(১৩৪.৭)	(৭২৯.৬)	(৯৫৯.০)	(৮২১.৩)	(৪৮৮.৩)	(৪৩১.৯)	(৪৬৮.৪)	(৩৮৭.৬)
২০০০-২০০১	২৪,৭৯৬	১,৭২৫	১৩,৬২৮	১২,৫৮৮	৫২,৭৩৭	২৬৭,৭৬৯	১১৯,৮৭৮	৩৮৭,৬৪৭	২৯৪.১
	(১২৭১.৬)	(২০১.০)	(৮২৭.৪)	(১১৪৪.৪)	(৯৪৯.৪)	(৫৪৫.৯)	(৪৪৭.৮)	(৫১১.২)	(৪৩০.৬)

* ১৯৮৬-৮৭ সালে কন্টেইনার সার্ভিস চালু হয় এবং শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর ও ঢাকা ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো (আই সি ডি) এর মধ্যে চলাচল করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্যের অনুপস্থিতিজনিত কারণে ১৯৯২-৯৩ বছরকে ভিত্তি বছর ধরা হয়েছে।

উৎসঃ লেখক কর্তৃক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

এর সভাপতি। ডাইরেক্টর জেনারেলকে সাহায্য করার জন্যে নিয়োগ করা হয় ৫ জন অতিরিক্ত ডাইরেক্টর জেনারেল এবং ৯ জন যুগ্ম ডাইরেক্টর জেনারেল। দু'জোনের ডুজেনারেল ম্যানেজারকে সাহায্য করার জন্যে আছে বিশেষায়িত বিভিন্ন বিভাগ। এ সকল বিভাগ অপারেশন, মেইন্‌টেন্যান্স ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রত্যেকটি জোনকে আবার দু'টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো মূল অপারেশন ইউনিট হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার যার অধীনে রয়েছে বিভিন্ন বিশেষায়িত ডিপার্টমেন্ট ঃ পারসোনেল, পরিবহণ, কমার্শিয়াল, ফিন্যান্স, মেকানিক্যাল, ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস, সিগন্যালিং, ইলেকট্রিক্যাল, মেডিক্যাল, নিরাপত্তা বাহিনী ইত্যাদি। এছাড়াও আছে দু'টি ওয়ার্কসপঃ পূর্ব জোনেরটি পাহারতলীতে এবং পশ্চিম জোনেরটি সৈয়দপুরে। এগুলোর ব্যবস্থাপনা একেক জন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের উপর ন্যাস্ত আছে। আরও রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ ওয়ার্কসপ (পাবর্তীপুরে) যেখানে ব্রডগেজ্‌ ও মিটারগেজ্‌ ইঞ্জিনগুলো ওভারহলিং ও মেরামত করা হয়। এর দায়িত্বে আছেন একজন চীফ এক্সিকিউটিভ।

বাংলাদেশ রেলওয়ের রয়েছে একটি রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী যার দায়িত্বে আছেন একজন রেক্টর। চীফ প্ল্যানিং অফিসার আছেন প্ল্যানিং সেলের দায়িত্বে। গভর্নমেন্ট রেলওয়ে ইন্‌স্পেক্টর আছেন সেফটি ইন্‌স্পেক্টরেটের দায়িত্বে। কেন্দ্রীয় ষ্টোরের দায়িত্বে আছেন প্রধান ষ্টোর নিয়ন্ত্রক এবং হিসাব বিভাগের দায়িত্বে আছেন একজন অতিরিক্ত ডাইরেক্টর জেনারেল (ফাইন্যান্স) যিনি ডুজোনের আর্থিক কর্মকান্ডের তদারকি করে থাকেন। যেমনটা দেখা যাচ্ছে উপরের বিবরণে যে, বিশাল এবং মাথাভারী ব্যবস্থাপনা কাঠামো বিদ্যমান বাংলাদেশ রেলওয়েতে। ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের নামে বারে বারে করা হয়েছে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু রেলের ব্যবস্থাপনা মোটেও উন্নত হয়নি। আরও খারাপই হয়েছে বলা যায়। বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্বত্র অব্যবস্থাপনার ছাপ বিদ্যমান। মনে হচ্ছে এর কোনও মা-বাপ নেই। রেলওয়ের জমির বেশীর ভাগই জবর দখলে (বেদখল) চলে গেছে। অহরহ চুরি যাচ্ছে জ্বালানী, লোহা-লক্কর, কল-কব্জা, স্লিপার ইত্যাদি। এসব থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের লোকসানের কারণ খুঁজতে বোধ করি পাগলেরও বেগ পেতে হবে না।

বাংলাদেশ রেলওয়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি। অবশ্য এটা গোটা বাংলাদেশেরই সমস্যা। এমনি এমনি কি আর দুর্নীতিতে চার চার বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ (২০০১-২০০৪)। বাংলাদেশ রেলওয়ের দুর্নীতি সর্বগ্রাসী। রেলের হাজার হাজার একর অব্যবহৃত জমি দশকের পর দশক অবৈধ দখলদারদের দখলে আছে, অথচ কর্তৃপক্ষের তাতে কিছু যায় আসে না। টাউট রাজনীতিবিদ, মাস্তান-চাঁদাবাজ ও রেলের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এর সাথে জড়িত বলে প্রায়ই সংবাদপত্রে খবর বেড় হচ্ছে (১৮, ২৬ঃ১১ঃ০৪)। রেলের জমি নামমাত্র মূল্যে মন্ত্রী বিক্রি করেছেন নিকট আত্মীয়ের কাছে। মন্ত্রী সুপারিশ করছেন শত শত দলীয় ক্যাডারের চাকুরির জন্যে যার সাথে জড়িত আছে লক্ষ লক্ষ টাকার অবৈধ লেন-দেন (১৮, ০৬ঃ১১ঃ০৪)। রেলের জায়গায় গড়ে উঠেছে অবৈধ মার্কেট, বাড়ী, বস্তি আরও কত কি। মাঝে মধ্যে উদ্ধার তৎপড়তা চললেও কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার যেইসেই। কারণ এর সাথে জড়িত রয়েছে প্রভাবশালীদের কায়েমী স্বার্থ। দুর্নীতি রয়েছে নির্মানে, দুর্নীতি রয়েছে কেনাকাটায়, যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে (১৯,৩০ঃ১১ঃ০৪)। আর লোকসানের বোধ করি সবচেয়ে বড় কারণ এটাই।

সারণী ১০ : জেলাভিত্তিক বাংলাদেশ রেলওয়ের লাইন ও ষ্টেশনের চিত্র, ২০০১ সালে

জেলার নাম ও ক্রমিক নং	ষ্টেশন		লাইন		জেলার নাম ও ক্রমিক নং	ষ্টেশন		লাইন	
	সংখ্যা	স্থান	দৈর্ঘ্য কিঃ মিঃ	স্থান		সংখ্যা	স্থান	দৈর্ঘ্য কিঃ মিঃ	স্থান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১। বাগের হাট	-	-	২১.২৩	XXXVIII	২৩। রংপুর	০৭	১৪শ	৭০.৭১	XVI
২। খুলনা	০৯	১২শ	৩২.১৯	XXXIV	২৪। গাইবান্ধা	১২	৯ম	৯৮.৯৭	VIII
৩। যশোর	১১	১০ম	৮৯.৫৮	IX	২৫। বগুড়া	১৬	৬ষ্ঠ	৮৪.৮৯	XII
৪। ঝিনাইদহ	০৫	১৫শ	৩৫.৮০	XXXIII	২৬। টাঙ্গাইল	০১	১৮শ	০৫.০০	XXXXIII
৫। চুয়াডাঙ্গা	১০	১১শ	৪৩.৪৫	XXX	২৭। জামালপুর	১৯	৪র্থ	৯৯.০০	VII
৬। ফরিদপুর	-	-	৪৬.৪৩	XXVIII	২৮। নেত্রকোনা	১৩	৮ম	৭০.৩০	XVII
৭। গোপালগঞ্জ	০৩	১৬শ	১২.৯৯	XXXXI	২৯। কিশোরগঞ্জ	১১	১০ম	৭৮.৭৫	XIII
৮। রাজবাড়ী	১০	১১শ	৮৮.৮৪	X	৩০। ময়মনসিংহ	২৪	৩য়	১৩২.০০	III
৯। কুষ্টিয়া	০৭	১৪শ	৭৮.০০	XIV	৩১। গাজীপুর	১১	১০ম	৬৪.১৫	XIX
১০। সিরাজগঞ্জ	১৮	৫ম	৫২.৩০	XXII	৩২। ঢাকা	০৭	১৪শ	২৭.৫০	XXXVI
১১। পাবনা	১০	১১শ	৪৮.২৫	XXVI	৩৩। নারায়নগঞ্জ	০২	১৭শ	০৯.৫০	XXXXII
১২। নবাবগঞ্জ	০৬	১৫শ	৪৮.৪৮	XXV	৩৪। নরসিংদি	১২	৯ম	৪৬.৫৮	XXVII
১৩। রাজশাহী	১৩	৮ম	৬৯.৭৫	XVIII	৩৫। সুনামগঞ্জ	০৩	১৬শ	১৩.৯০	XXXX
১৪। নাটোর	০৮	১৩শ	৬১.১৬	XX	৩৬। ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৬	৬ষ্ঠ	৭২.০৭	XV
১৫। নওগাঁ	০৫	১৫শ	১৯.৫৫	XXXIX	৩৭। হবিগঞ্জ	২৫	২য়	৮৫.৮৭	XI
১৬। জয়পুরহাট	০৫	১৫শ	৪৩.৮৫	XXIX	৩৮। মৌলভীবাজার	১৪	৭ম	১২৫.৩৩	IV
১৭। ঠাকুরগাঁও	০৭	১৪শ	৪২.৬৫	XXXI	৩৯। সিলেট	০৮	১৩শ	৫০.৬৪	XXIV
১৮। পঞ্চগড়	০৫	১৫শ	২২.৫৩	XXXVII	৪০। নোয়াখালী	০৮	১৩শ	২৮.৪৪	XXXV
১৯। নীলফামারী	০৯	১২শ	৫৯.৫৫	XXI	৪১। চাঁদপুর	১০	১১শ	৪০.৬৯	XXXII
২০। কুড়িগ্রাম	১০	১১শ	৪২.৬৫	XXXI	৪২। কুমিল্লা	১৬	৬ষ্ঠ	১০৯.৩৬	VI
২১। দিনাজপুর	০৮	১৩শ	১৫৯.৩৯	II	৪৩। ফেনী	০৫	১৫শ	৫০.৬৯	XXXIII
২২। লালমনিরহাট	১৬	৬ষ্ঠ	১১০.৯৭	V	৪৪। চট্টগ্রাম	৪৪	১ম	১৭৪.৩২	I

উৎসঃ লেখক কর্তৃক ৪ ও ৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

আধুনিকায়নের সমস্যা বাংলাদেশ রেলওয়ের আর একটি প্রকট সমস্যা। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রেল লাইনগুলো অত্যন্ত নড়বড়ে, ইঞ্জিনগুলো অত্যন্ত পুরাতন (বেশীর ভাগই মেয়াদোত্তীর্ণ) ও জড়াগ্রস্থ, রয়েছে মেরামত ও ওভারহলিং এর সুযোগ-সুবিধার অভাব, দক্ষ জনবলের অভাব, প্রশিক্ষণ সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা। ঘাটতি বিদ্যমান ইঞ্জিন ওয়াগনের ক্ষেত্রে। ষ্টেশন ও টার্মিনালগুলো অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ, ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধপূর্ণ। সর্বোপরি রয়েছে ট্রেনগুলোর গতির সমস্যা, সময়ানুবর্তিতার সমস্যা। আছে নিরাপত্তার সমস্যা। অতএব, সহজেই বোধগম্য কেন জনগণ রেলের উপর আস্থা হাড়িয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে একবিংশ শতাব্দীর পরিবহণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে আমাদের মতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে ঃ

১। বিদ্যামন লাইনগুলোর সংস্কার করে দ্রুততর অন্ততঃ ১০০ কিঃ মিঃ বেগে ট্রেন চলার উপযোগী করতে হবে। লাইনের দৈর্ঘ্য পরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি করে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে গোটা বাংলাদেশকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে। বর্তমানের ৪৪ টির জায়গায় ৬৪টি জেলাকেই রেললাইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

২। বাংলাদেশ রেলের রোলিং ষ্টকের নবায়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছে বহু আগেই। পরিকল্পিতভাবে এবং অব্যাহতভাবে ইঞ্জিন, ওয়াগন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে রোলিং ষ্টক আমাদের দেশে প্রস্তুত করার সামর্থ্য গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে ভারত, চীন ও কোরিয়ার মত দেশগুলোর সহযোগিতা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একবিংশ শতাব্দীর পরিবহণ ব্যবস্থা বলতে রেল পরিবহণ ব্যবস্থাকেই বুঝতে হবে। একটি যাত্রীবাহী ট্রেন কম করে হলেও ৫০টি বাসের বিকল্প হতে পারে এবং একটি মালবাহী ট্রেন কমপেক্ষ ১০ টনী ৮০টি ট্রাকের বিকল্প হতে পারে। তেল পরিবহনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুবিধা রয়েছে ট্রেনের। সুতরাং ট্রেনের সংখ্যা বাড়ালে স্বাভাবিকভাবেই সড়ক পথের উপর চাপ হ্রাস পাবে। ফলে হ্রাস পাবে যানজট এবং রাস্তার রক্ষনাবেক্ষন খরচ। বেঁচে যাবে বিপুল অংকের সরকারী অর্থ যা রেলওয়ের উন্নতির জন্যে ব্যয় করা সম্ভব। তাছাড়া পরিবেশ দুষনের হাত থেকেও আমাদের দেশ রক্ষা পাবে।

৩। সকল ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাদ দিয়ে রেলওয়ের জন্যে পৃথক মন্ত্রনালয় সৃষ্টি করতে হবে। রেলওয়ে আসলেই বিশাল ব্যাপার। একে খাটো করে দেখলে ভুল হবে। রেলওয়ের জন্য পৃথক বাজেটের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ভারতসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এরকম ব্যবস্থা চালু আছে। রেলওয়ের ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়নে এর কোন বিকল্প আছে বলে আমরা মনে করিনা।

৪। দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন করতে হবে। রেলের সমস্ত অব্যবহৃত জমির অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মার্কেট করা যেতে পারে, ফার্ম গড়ে তোলা যায়, রেস্টুরেন্ট গড়ে তোলা যায়, হোটেল গড়ে তোলা যায়, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে পর্যটন কেন্দ্রও গড়ে তোলা যায়। যেখানে যেটা উপযোগী সেখানে সেব্যবস্থাই নিতে হবে। কোন অবস্থাতেই রেলের জমি অবৈধ দখলে থাকবেনা, অব্যবহৃত থাকবে এটা নিশ্চিত করতে হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়া অবশ্যই স্বচ্ছ ও আইনানুগ হতে হবে। দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে এর কোনও বিকল্প নেই। নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়কৃত জমি উদ্ধারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। টিকেট বিক্রয় ও মাল বুকিং এর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা সর্বত্র চালু করতে হবে। কমিউটার ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, সান্মাসিক ও

বাৎসরিক ভিত্তিতে হ্রাসকৃত মূল্যে কার্ড বিক্রয়ের পদ্ধতি চালু করতে হবে। এতে করে রেলের আয় বাড়বে এবং এক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও আইনানুগ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়করণ ও দলীয়করণের মত বিষয়গুলো চিরতরে বন্ধ করতে হবে। সর্বস্তরে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুষ্টের দমন ও শিষ্ঠের লালনের ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়ন - এটা সময়ে দাবী। বর্তমানের মত নড়-বড়ে অবস্থা নিয়ে আমাদের রেলওয়ে দেশের অর্থনীতির পরিবহণ চাহিদা ও এ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ কখনই মোকাবেলা করতে পারবে না। অবশ্যই বাংলাদেশ রেলওয়ের গতি বাড়াতে হবে। আর তা করতে হলে এর বিদ্যমান লাইনগুলোর আধুনিকায়ন করতে হবে। অন্ততঃ ১০০ কিঃ মিঃ বেগে ট্রেন চলার উপযোগী করতে হবে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশের সকল সেতুতে রেল লাইনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। অত্যাধুনিক সিগনালিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হবে। অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রশিক্ষণ একাডেমীর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে এরকম একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্যে দেশের অভ্যন্তরেই ইঞ্জিন ও ওয়াগন তৈরীর কারখানা গড়ে তুলতে হবে এবং বিদ্যমান কারখানাগুলোর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

অবশ্যই উপরোক্ত কাজগুলো করার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। আমরা মনে করি দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সরকারকে এখনই এ ব্যাপারে উদ্দ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। সড়ক পথের সম্প্রসারণ মন্থর করতে হবে এবং এভাবে সাশ্রয়কৃত অর্থ রেলকে দিতে হবে। বিদ্যমান সড়ক পথের রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষেত্রে সাশ্রয়কৃত (রেলের সম্প্রসারণের ফলে) অর্থও রেলওয়েকে দিতে হবে। সর্বোপরি রেলের জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির অর্থনৈতিক ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে প্রচুর অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব বলে আমরা মনে করি। তা ছাড়া উপরোক্ত আমাদের সুপারিশগুলো বাস্ত-বায়নের ফলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনেও লাভ আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্ভাবনা

রেল পরিবহণের সম্ভাবনা অনেক এবং বহুমুখী যার কানাকড়িও আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি নি। বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্ভাবনাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায় ঃ

১। এখনও বাংলাদেশে রেল পরিবহণই হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পরিবহণ ব্যবস্থা (সারণী-১১)। সারণী-১১ এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত প্রায় এক দশকে রেলের ভাড়া যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে ১৯৯৩-৯৪ সালের যাত্রী-কিলোমিটার প্রতি ০.২৩ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে ০.৩৬ টাকা হলেও বাসের ভাড়া বেড়ে ১৯৯৩-৯৪ সালের ০.৩২ টাকা থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালে ০.৪৭ টাকা হয়েছে। বিমান পরিবহণ তো খুবই ব্যয়বহুল। জল পরিবহণ সস্তা হলেও সময় বেশী লাগায় প্রকৃত অর্থে ব্যয়বহুলই হচ্ছে। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও অন্যান্য পরিবহণের চেয়ে রেল পরিবহণ অনেক সস্তা। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দুর্নীতি ও অপচয় হ্রাস করতে পারলে রেলের ভাড়া এখনকার চেয়ে অনেক কম হওয়ারই কথা।

২। সার্ক সহযোগিতার আওতায় ভারত ও নেপালসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশকে অত্যাধুনিক রেল পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ট্রান্স এশিয়ান

সারণী ১১ : বাংলাদেশের সরকারী খাতের বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ মাধ্যমের ভাড়ার তুলনামূলক চিত্র, ১৯৯৩-২০০০ সময়ে

পরিবহণ মাধ্যমের নাম	যাত্রী ভাড়া, যাত্রী প্রতি প্রতি কিঃমিঃ, টাকা							মালভাড়া,* প্রতি টন প্রতি কিঃমিঃ, টাকা						
	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১। বাংলাদেশ রেলওয়ে	০.২৩	০.২৩	০.২৫	০.২৬	০.২৯	০.৩৫	০.৩৬	১.৩০	১.৩৭	১.৪১	১.২৪	১.৩৯	১.৪২	১.৪৭
২। বিআরটিসি	০.৩২	০.৩২	০.৩২	০.৩২	০.৩২	০.৩২	০.৪৭	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০
৩। বিআইডব্লিউটিসি	০.৩৩	০.৩৩	০.৩৩	০.৩৩	০.৩৩	০.২৬	০.২৬	১.১২	১.১২	১.১২	১.১২	১.১২	১.১২	১.১২
৪। বাংলাদেশ বিমান	২.৭৩	২.৬৯	২.৬২	২.৮৪	২.৮২	২.৯৪	২.৯৯	০.৪০	০.৪২	০.৪২	০.৪৩	০.৪৪	০.৪৫	০.৪৫

* বাংলাদেশ বিমানের ক্ষেত্রে প্রতি পাউন্ড প্রতি কিঃ মিঃ এর ভাড়া।

উৎসঃ লেখক কর্তৃক ১ ও ২ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

রেলওয়ে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চীন, ভারত ও থাইল্যান্ডসহ অনেক দেশই ইতোমধ্যে তাদের রেলওয়েকে সম্প্রসারিত করছে এবং আধুনিক করে গড়ে তুলছে। বাংলাদেশ এখনও কাজই শুরু করে নি (১৪)। ট্রানজিট সুবিধা দিলে আমাদের দেশ যথেষ্ট লাভবান হবে। দেশের অভ্যন্তরে সেবা ও পর্যটন খাত দ্রুত বিকশিত হবে। অন্যান্য দেশ আমাদের বন্দরগুলো ব্যবহারে আগ্রহী হবে বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো এবং নেপাল ও ভূটান। আর তখন কন্টেইনার সার্ভিসের গুরুত্ব অনেকগুণে বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজন হবে চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা বন্দরের আধুনিকায়ন। আর আমরা যদি আমাদের বন্দরগুলোকে এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করতে পারি তা'হলে রেলওয়ের রাজস্ব বৃদ্ধির অভূতপূর্ব সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। আর ট্রানজিট ডিউটি হিসেবে বাংলাদেশের প্রচুর রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। অতএব, বাংলাদেশ সরকারকে এ দিকে আশু দৃষ্টি দিতে হবে। সময় ক্ষেপনের কোনও সুযোগ নেই। অর্থের কোনও অভাব হবে বলে আমরা মনে করি না। কারণ সংশ্লিষ্ট দেশগুলো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এখাতে অর্থ ঢালার জন্যে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে (১৪)।

৩। আমাদের দেশে বড় বড় শহরগুলোকে কেন্দ্র করে অন্ততঃ ১০০ কিঃমিঃ রেডিয়াসের মধ্যে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের সার্ভিস গড়ে তোলা ছাড়া

সারণী ১২ : বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দের চিত্র, ১৯৭৩-২০০২ সময়ে

মিলিয়ন টাকা, %

মেয়াদসহ পরিকল্পনার নাম	খাতসমূহ						
	পরিবহণ		বাংলাদেশ রেলওয়ে			সরকারী	
	মোট	সরকারী খাতের অংশ	মোট	পরিবহণ খাতের অংশ	সরকারী খাতের অংশ	মোট	অংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)	৫,২৭৬.১	০৮.২	১,২৬১.৩	২৩.৯	০২.০	৬৪,২৯৫.০	১০০.০
২। দু' বছর মেয়াদী পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)	৪,৫০০.০	১৮.৫	১,২৩০.৮	২৭.৪	০৫.১	২৪,২৬১.০	১০০.০
৩। ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)	১২,৮৬৪.৬	০৬.৫	৪,১৩৩.৯	৩২.১	০২.১	১৯৬,৬৭৬.০	১০০.০
৪। ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)	৩০,০২৩.০	১১.৪	৮,৩৬০.০	২৭.৮	০৩.২	২৬৪,২৩৪.০	১০০.০
৫। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)	৬৩,৭৩০.০	১৮.৫	৮,৩৫০.০	১৩.১	০২.৪	৩৪৫,২৩১.০	১০০.০
৬। পরিকল্পনাহীন দু'বছর (১৯৯৫-৯৭)	৪৫,৪৭৯.০	১৫.৪	৩,৯৮৬.৭	০৮.৮	০১.৩	২৯৫,৬০০.০	১০০.০
৭। ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)	১১৮,০০০.০	১০.৭	২৪,০০০.০	২০.৩	০২.২	১১০০,৫৮২.০	১০০.০

উৎসঃ লেখক কর্তৃক ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

বর্তমানের দুঃসহ জানজট কখনই দূর করা যা বেনা। এটা গড়ে তুলতে পারলে মানুষ তখন আর বসবাসের জন্যে শহরমুখো হবে না। এমন কি শহুরে শিক্ষিত ও চাকুরীজীবী মানুষও তখন পরিবেশগত সুবিধার কারণে মফস্বলে বসতি গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। চাপ কমবে বড় বড় শহরগুলোর উপর। এ ধরনের ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সকল বড় বড় শহর এলাকাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। এমন কি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কোলকাতা, মুম্বাই ও দিল্লীসহ বেশ কিছু বড় বড় শহরকে কেন্দ্র করে এ ধরনের কমিউটার ট্রেন সার্ভিস গড়ে উঠেছে। কোলকাতায় তো পাতাল রেল মেট্রোও গড়ে তোলা হয়েছে যার ফলে এর তীব্র জানযট সমস্যার চিরতরে সমাধান সম্ভব হয়েছে। যেটা বিশ্বের সর্বত্রই বিদ্যমান, কমিউটার ট্রেনে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, সান্মাষিক এমন কি বার্ষিক টিকেট বা কার্ডের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে করে ভাড়া ফাঁকি রোধ করা যাবে এবং দুর্নীতি হ্রাস পাবে। আর তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্যে বর্তমানের মত এত বেশী ডর্মিটরী, ছাত্রাবাস বা অতিথিভবন নির্মাণ করতে হবে না। সাশ্রয় হবে বিপুল অর্থ সরকারের ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর যার দ্বারা তারা অনেক অনেক বেশী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে পারবে। তবে প্রাথমিকভাবে এ ধরনের ব্যবস্থা রাজধানী ঢাকা, বানিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম এবং খুলনা ও রাজশাহীর মত মহানগরীগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে। পরবর্তীতে এ ধরনের ব্যবস্থা অন্যান্য বড় বড় শহর এলাকায়ও সম্প্রসারিত করতে হবে। এ ব্যাপারে সময়ক্ষেপণ ও গড়িমসি অবশ্যই বিদ্যমান অপচয় ও সমস্যাসমূহকে আরও বাড়িয়ে দিবে। অতএব, পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সময়।

৪। ঢাকা শহরে অবশ্যই পাতাল রেল মেট্রো গড়ে তুলতে হবে। এলিভেটর ট্রেন সার্ভিসসহ সকল ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিত্যাগ করে মেট্রো তৈরীর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। কারণ ঘিন্জী মহানগরীতে উপরের দিকে পরিবহণ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কোনও সুযোগ নেই। যেতে হবে পাতালের দিকে। আমরা মনে করি সদর ঘাট থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একটি মেট্রো লাইন এবং সদরঘাট-রায়েরবাজার স্মৃতিসৌধ-মিরপুর শেরে বাংলা ষ্টেডিয়াম-ক্যান্টনমেন্ট-কমলাপুর-সদরঘাট এ রকম একটি সার্কেল লাইন নির্মাণ করতে পারলেই ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা চিরতরের জন্য শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এ কাজের জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। তবে যত অর্থই লাগুক না কেন দেশের তথা ঢাকার ভবিষ্যত চিন্তা করে এ কাজে পিছপা হলে চলবে না। অর্থের জন্যে রয়েছে দেশের জনগণ ও ঢাকাবাসী, রয়েছে দেশীয় রিয়েল এষ্টেট সিন্ডিকেটসহ অন্যান্য পুঁজিপতি গোষ্ঠী, আছে আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠী। এছাড়াও আছে বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ। প্রাক্তণ সোভিয়েত ইউনিয়ন এ অঞ্চলে কোলকাতায় মেট্রো নির্মাণ করে দিয়েছে। অতএব, তাদের রয়েছে পলিমাটিসমৃদ্ধ দ্বীপ এলাকায় মেট্রো নির্মাণের অভিজ্ঞতা। তাদের পরামর্শ ও সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া জাপান ও চীন তো রয়েছেই। তারাও নিশ্চয়ই সাহায্য ও পরামর্শ দিতে রাজী হবে। প্রয়োজন শুধু দূর দৃষ্টিসম্পন্ন ও উদ্দ্যোগী নেতৃত্ব।

উপসংহার

শিক্ষা যেমন মানুষের চোখ খুলে দেয়, রেল পরিবহণ তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক গতিময়তা বৃদ্ধি করে। পৃথিবীর যে জাতি যত দ্রুত এটা বুঝতে পেরেছে সে জাতি তত দ্রুতই দেশের উন্নতি নিশ্চিত করতে পেরেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশে এ দুটো খাতেরই এখনও বেহাল অবস্থাঃ দু'টোতেই বিরাজ করছে নৈরাজ্য। আমাদের সরকারগুলো

বিশেষ করে পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক সরকারগুলো এ দু'টো খাতকেই চরমভাবে অবহেলা করেছে। নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত শিক্ষার চেয়ে সামরিক খাতে বরাদ্দ ছিল বেশী। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে নাম মাত্র শিক্ষা ও সামরিক খাতের বরাদ্দ প্রায় সমান সমান করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েও থেকে যায় অবহেলিত (সারণী-১২)। বাংলাদেশের পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী খাতের মোট বরাদ্দের মাত্র ২.০% থেকে ৩.২% পায় বাংলাদেশ রেলওয়ে, অথচ মোট পরিবহণ খাতের অংশ ছিল ৮.২% থেকে ১৮.৫% এর মধ্যে। পরিবহণ খাতের এক তৃতীয়াংশের কম বরাদ্দ পায় বাংলাদেশ রেলওয়ে (সর্বোচ্চ ৩২.১% পায় ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং সর্বনিম্ন ১৩.১ শতাংশ পায় ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায়)। অথচ হওয়া উচিত ছিল উল্টোটা, অর্থাৎ সিংহভাগ বরাদ্দ অন্ততঃ ৬০.০% বরাদ্দ রেলওয়ের জন্যে দেয়া উচিত ছিল। সড়ক পথের পিছনে বেশী ব্যয় করেও মান সম্পন্ন সড়ক পায় নি আমাদের জনগণ। অথচ পরিকল্পিতভাবে সুসমন্বয়ের মাধ্যমে যদি সড়ক ও রেলওয়েকে আমরা গড়ে তুলতাম এবং সম্প্রসারিত করতাম, তা'হলে বিপুল পরিমাণ জমি ও অর্থের অপচয় অনেকাংশেই রোধ করতে পারতাম। দেশ থাকতো আজ যানজটমুক্ত এবং আমাদের সড়কগুলোর স্বাস্থ্যও থাকতো ভাল। সড়কপথের উপর অস্বাভাবিক (রেলের অনুপস্থিতিতে) চাপ পড়ায় দ্রুত সেগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ঘন ঘনই মেরামত করতে হয়। আসলে পচাঁত্তর পরবর্তী সরকারগুলো বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এর মত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর কুপরামর্শে সড়ক পথের বিকাশের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং বেসরকারী খাতের পরিবহণ মালিকদের স্বার্থে রেলওয়ের বিকাশকে নানভাবে বাধাগ্রস্থ করেছে। বিআরটিসি বাস সার্ভিসের ব্যাপারটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। বেসরকারী পরিবহণ মালিকদের দাবী রেললাইন বাড়ানো যাবে না, যেগুলো আছে বন্ধ করতে হবে, বিআরটিসি বন্ধ করতে হবে যাতে তারা লাভ করতে পারে। তারা প্রতিযোগিতায় যেতে চায় না। তারা সরকারী খাতের পরিবহণ মাধ্যম (রেলওয়ে ও বিআরটিসি) ও দেশের জনগণকে জিম্মি করে ব্যবসা করতে চায়, অতিরিক্তি লাভ করতে চায়। এর নাম পুঁজিবাদ হতে পারে না। এর নাম স্রেফ সামন্তবাদ। সরকারকে অবশ্যই এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বেসরকারী খাত যদি সরকারী খাতের চেয়ে দক্ষই হয় তা'হলে সরকারী খাতের পরিবহণ মাধ্যমের সাথে প্রতিযোগিতা করেই তাকে এর প্রমাণ দিতে হবে। অবশ্য গোটা বিষয়টিই গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশে যা বলা যায় অনুপস্থিত। আমরা সেদিনের অপেক্ষায় থাকলাম যেদিন ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠী স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ সবার বিশেষ করে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর চিন্তা ও চেতনায় প্রাধান্য পাবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. B.B.S., GOB: Statistical Yearbook of Bangladesh 2001, Dhaka, 2003.

২. B.B.S., GOB: Statistical Yearbook of Bangladesh 2000, Dhaka, 2002.

৩. B.B.S., GOB: Statistical Yearbook of Bangladesh 1981, Dhaka, 1982.

৪. Bangladesh Railway: Information Book 2001, Rail Bhaban, Dhaka, 2002.

৫. Bangladesh Railway: Information Book 1999, Rail Bhaban, Dhaka, 2000.

৬. Planning Commission, GOB: The First Five Year Plan 1973-78, Dhaka, 1973.

৭. Planning Commission, GOB: The Second Five Year Plan 1980-85, Dhaka, 1980.

৮. Planning Commission, GOB: The Third Five Year Plan 1985-90, Dhaka, 1985.

৯. Planning Commission, GOB: The Fourth Five Year Plan 1990-95, Dhaka, 1990.

১০. Planning Commission, GOB: The Fifth Five Year Plan 1997-2002, Dhaka, 1997.

১১. World Bank: The World Development Indicators 2003, Washington, 2003.

১২. The Countries of the World, Politizdat Moscow, 1979.

১৩. The Soviet Union, Politizdat, Moscow, 1978.

১৪. Country Papers Presented at the International Seminar on the Benefits of Accession to International Conventions on Land Transport Facilitation for the Countries of SAARC Region, Dhaka, December 05-08, 1996.

১৫. Rumiantsev A.M. & Others: Economic Encyclopaedia, Vol. I-IV, Soviet Encyclopaedia, Moscow, 1972-1980.

১৬. খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ বাংলাদেশের বিদ্যুতায়নঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, আইবিএস জার্নাল ১৪০৬ঃ৭, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৪০৬, ২০০০ ।

১৭. খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাতের ভূমিকা, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি, চতুর্দশ খন্ড, ২য় সংখ্যা, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

১৮. দৈনিক সংবাদ ।

১৯. দৈনিক জনকণ্ঠ ।